العقيدة الصحيحة لإ قامة الدين

দ্বীন কায়েমের সঠিক আকীদা

শাইখ আব্দুল হালীম (রহঃ)

العقيدة الصحيحة لإ قامة الدين
দ্বীন কায়েমের সঠিক আকীদা

শাইখ আব্দুল হালীম (রহঃ)
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৯৮ ইং

চতুর্থ প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০১৫ ইং

প্রকাশনায়ঃ আদ্-দ্বীন প্রকাশনী

মূল্য ঃ ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

Deen Qayemer Shothik Aqeeda
Written by : Sheikh Abdul Halim (Rh)
Published by : Addin Prokashoni
First Print: May 1998
Forth Print: October 2015
Price : Taka 30.00 Only

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَأَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

সূচীপত্র

দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে কী আকীদা রাখা উচিত?

মানুষ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে স্থির করে তার আকীদা ও বিশ্বাসের উপর। বাস্তব সত্য বলে সে মনের গভীরে যে আকীদা পোষণ করে, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব কিছু উজাড় করে দেয়, এমন কি জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। যুগে যুগে নাবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ সঠিক আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানের নজরানা পেশ করেছেন। তদ্রুপ কাফের-মুশরিকরাও তাদের বাতিল আকীদা ও বিশ্বাসের জন্য জীবন দিয়েছে।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ ব্যাপারে অন্তরের অন্তস্থলে যদি কোন বিশ্বাস না থাকে, তাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কখনই নিবেদিত হওয়া সম্ভব নয়। যদি কখনও দেখা যায় এতদিন যে আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে আসছে, তা ভূলে ভরা বাতিল ও ভ্রান্ত, তখনি নেমে আসে চরম হতাশা। তাই দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে যারা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন, হাজারো ভিড়ের মাঝে তাদেরকে এর সঠিক আকীদা খুঁজে বের করতে হবে।

দ্বীন কায়েমের প্রশ্নে সমাজে বিভিন্ন আকীদার লোক দেখা যায়। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে কোন আকীদাটি নির্ভূল ও সত্য এ সম্পর্কে সন্তোষজনক জবাব পেতে হলে আগে জানা দরকার, বর্তমান সমাজে কী কী আকীদা প্রচলিত রয়েছে। আমাদের জানা মতে দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে প্রধানতঃ চার ধরণের আকীদা প্রচলিত রয়েছে।

১। সমাজ সংস্কার। ২। সমাজ বিপ্লব।
৩। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ৪। গণ-অভ্যুত্থান।

১. সমাজ সংস্কারঃ এ আকীদার ধারক ও বাহকগণ বিশ্বাস করেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সমাজ থেকে কতিপয় শির্ক ও বিদ্আ'ত উৎখাত করে ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে কলুষমুক্ত ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। বিধায় তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কোন পদক্ষেপ নেন না, এ জন্য কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদ করার প্রয়োজনও মনে করেন না এবং গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ইসলামদ্রোহী শক্তি নির্মূল করার কথাও বলেন না; বরং এ ধরণের ভ্রান্ত মতাদর্শের লোকদের সমন্বয়ে পরিচালিত জামাআ'তকেই নির্ভেজাল তাওহীদি জামাআ'ত দাবী করে জিহাদ বিমুখ কর্মকান্ডের মাধ্যমে তারা তথাকথিত সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২. সমাজ বিপ্লবঃ এ আকীদায় বিশ্বাসীগণ দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চান, কিন্তু তারা সশস্ত্র জিহাদকারীদের সমর্থন করেন না। তাদের মতে "জিহাদের

পদ্ধতি পরিবর্তনশীল এবং অসি যুদ্ধের চেয়ে মসি যুদ্ধ অধিকতর শক্তিশালী”[১] তারা আরো বলেন-“এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা হাতিয়ার হলো তিনটি- কথা, কলম ও সংগঠন।”[২] তাই তারা সশস্ত্র জিহাদকে এ যুগের জন্য উপযোগী মনে করেন না। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা সকল যুগের জন্যই সশস্ত্র জিহাদকে ফরজ করেছেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

অর্থঃ তোমাদের উপর কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) ফরজ করে দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২১৬)

কারো পছন্দ হোক বা না হোক সকল যুগের জন্য সশস্ত্র জিহাদের এ আদেশ জারী থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ وَجُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ

অর্থঃ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর আমার রিজিক বল্লমের (গণিমতের পন্থায়) ছায়ার নিচে রেখে দেয়া হয়েছে।[৩]

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِيْنَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ

অর্থঃ আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি ইছাবা (দল) সব সময় কিতাল করে যাবে, তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে।[৪]

তথাকথিত সমাজবিপ্লবীগণের আকীদা মতে যদি কেহ প্রচলিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি ভ্রান্ত মতাদর্শ গ্রহণ করে এবং ঐসব আদর্শের ভিত্তিতে দেশ শাসন করে, তবুও তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা যাবে না। এই ভ্রান্ত আকীদা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তারা নাবী-রসূলগণের উপর মিথ্যা তোহমত দিয়ে বলেন, “নাবী-রসূলগণ তাদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি।”[৫]

---

[৩]. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ৫৬/৮৮ ‘তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে অধ্যায়’। মুসনাদে আহমাদ ৫০৯৪।

[৪]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, ইসে. হাঃ ৪৮০৫।

[১,২,৫] টিকাঃ সমাজ বিপ্লবের ধারা (আন্দোলন সিরিজ- ৩) ১৯৯৪ ইং মার্চে প্রকাশিত বই এর ১৪ ও ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, নাবী-রসূলগণ তাদের যুগের প্রতিষ্ঠিত ত্বাগুতী শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোন কোন নাবী-রসূল ত্বাগুত শাসকদেরকে উৎখাত করে নিজে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আল্লাহর বিধান জারী করেছিলেন। আবার কেউ কেউ উৎখাত করতে না পারলেও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আজীবন সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে গেছেন।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

অর্থঃ আর বহু নাবী ছিলেন যারা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। আল্লাহর পথে তাদের উপর যত বিপদই এসেছিল সেজন্য তাঁরা হতাশ হননি, দুর্বলও হননি এবং দমেও যাননি। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৪৬)

অতএব, উপরোক্ত আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, নাবী-রসূলগণ সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু আলেম ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে নাবী-রসূলগণের আদর্শকে ভুলে গেছেন। তাই তারা জিহাদের জন্য অস্ত্র ব্যবহার বাদ দিয়ে শুধু কাগজ-কলম ব্যবহারের কথা বলছেন এবং মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদেরকে ক্ষমতা হতে উৎখাত করার চিন্তা করছেন না। তাই মনের অজান্তেই দুটি কাজকে তারা বেছে নিয়েছেনঃ

১. জিহাদকে অস্ত্র মুক্ত করে কাগজে কলমে রূপান্তরিত করা।
২. ত্বাগুতদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করার পক্ষপাতিত্ব করা।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো কাদিয়ানীদের আকীদা এবং ইসলাম বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র। বর্তমানে তাওহীদপন্থী কিছু আলেমও তাদের এই ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী হয়েছে। কাদিয়ানীরা যেমন ইংরেজ ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ না করার ফাতওয়া দিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে এ যুগের আলেমদের মধ্যেও কেউ কেউ মুসলমান নামধারী ত্বাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ না করার ফাতওয়া দিচ্ছে।

উপরে বর্ণিত সমাজ সংস্কার ও সমাজ বিপ্লব উভয় পদ্ধতির মাঝে দ্বীন ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করার কোন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী মোটেও দেখা যায়না। অথচ আল্লাহ তা’আলা নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নাবী-রসূলগণের প্রতি দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন-

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

অর্থঃ তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম, ইব্‌রাহীম, মুসা, ঈসা (আঃ) কে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করনা। (সূরা শুরা ৪২ ঃ ১৩)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

অর্থঃ তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে যাতে একে অন্য সমস্ত দ্বীনের (মতবাদের) উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠারূপে আল্লাহই যথেষ্ঠ। (সূরা আল ফাতাহ ৪৮ ঃ ২৮)

আল্লাহর প্রত্যেক নাবী-রসূল রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য তাঁদের সময়ের প্রতিষ্ঠিত বাতিল শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে গেছেন। নাবী-রসূলগণ ত্বাগুতী বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদেরকে ক্ষমতায় রেখে বা তাদেরকে উৎখাতের চেষ্টা না করে অন্য কোন সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেননি। কাজেই নাবী-রসূলগণের পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কার বা সমাজ বিপ্লব হতে পারে না।

অতএব সংস্কার করার যদি ইচ্ছাই থাকে তবে প্রথমে রাষ্ট্র হতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র সংস্কার করা উচিত। সুতরাং যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ না নিয়ে শুধু সমাজ সংস্কারের কথা বলে বেড়ান, তারা এক নতুন রাহবানিয়াত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

ঈসা (আঃ) এর অন্তর্ধানের পর তাঁর উম্মতের শাসকরা ইঞ্জিলের বিধানাবলী পরিবর্তন করে নিজেদের মনগড়া বিধান চালু করে। এই অবস্থা দেখে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ধর্মবিমুখ শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং এই আয়াত পড়ে পড়ে জনগণকে ত্বাগুত শাসকদরে বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেন।

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থঃ ইঞ্জিলের অনুসারীদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাতে যা অবতীর্ণ করেছে তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করা। আর যেসব লোক আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করে না, তারাই ফাসেক। (সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৪৭)

খাঁটি আলেমগণ আল্লাহর এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার ফলে শাসকরা তাঁদের হত্যা করে। আর কিছু সংখ্যক আলেম ভয়ে ভীত হয়ে ত্বাগুতী শাসকের বিরুদ্ধাচারণ না করে রাহবানিয়াত (বৈরাগ্যবাদ) পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

এদের একদল শাসকদের উদ্দেশ্যে বলে, "আমরা আপনাদের কোন বিরোধিতা করবনা। আমাদের জন্য সু-উচ্চ মিনার বানিয়ে দিন। সেখানে বসে বসে আল্লাহর ইবাদত করব। খাদ্যের প্রয়োজন হলে নিচে রশি নামিয়ে দেব। আপনারা তাতে খাদ্য বেঁধে দিবেন। আমরা কখনো নিচে এসে আপনাদের শাসন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবনা।" আর একদল বলে, "আমরা বনে-জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করব। আপনাদের শাসন ক্ষমতার ধারে কাছেও আসব না।"

অন্য আরেক দল বলে, "আমরা এদেশেই থাকব, আপনাদের আশে পাশেই চলাফেরা করব এবং শুধু খাদ্যের অনুসন্ধান করব। যেমন পশুরা করে থাকে। আমরা আপনাদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করব না; বরং আমরা গৃহপালিত পশুর মত আপনাদের অনুগত হয়ে থাকব।" একথা শুনে শাসকরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। (সূরা আল-হাদিদ ২৭, দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীরে)

অতএব এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

অর্থঃ আর রাহবানিয়াত (বৈরাগ্যবাদ) সেতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি। (সূরা আল হাদিদ ৫৭ ঃ ২৭)

ঐ সমস্ত রাহেবরা লোকদেরকে শরীয়তের কিছু কিছু বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু দ্বীনকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার আয়াতগুলোকে আড়াল করে রাখত। রাহেবদের মতো আজকের আলেমরাও দ্বীনকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার আয়াতগুলোকে আড়াল করে রাখছেন অর্থাৎ সেগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য কাউকে উৎসাহ দিচ্ছেন না; বরং দ্বীনের শুধু ঐ কাজগুলোই করার জন্য জনগণকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, যেগুলো করলে ত্বাগুত সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাধার সম্ভাবনা নেই।

কেউ কেউ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মতবাদকে পৃথক কোন ধর্ম বলতে চান না। তারা বলেন, "ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এগুলো দলীয় ব্যাপার মাত্র।" প্রকৃতপক্ষে

এসব মতবাদ যদি ইসলাম ধর্মের বিপরীতে কোন আলাদা ধর্মই না হত, তাহলে তাদের রচিত সংবিধান ইসলামী সংবিধান হতে আলাদা কেন এবং মুসলিম নামধারী ঐ সমস্ত পার্টির নেতারা ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইন চালু করেনা কেন? আসলে এখানে বিষয়টি স্পষ্ট যে, এই মতবাদগুলো ইসলাম ধর্মের বিপরীতে আলাদা ধর্ম এবং এর সংবিধান হচ্ছে ত্বাগুতী সংবিধান। যেমন আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও তাঁর সংবিধান হচ্ছে আল কুরআন। আর ঐ সমস্ত পার্টির নেতারা হচ্ছে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে মানুষের তৈরী করা আইন বাস্তবায়নকারী ত্বাগুত। অতএব শাসন ক্ষমতা হতে ত্বাগুতদেরকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক নাবী-রসূল ও ঈমানদারগণের প্রধান দায়িত্ব।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই আমি রসূল পাঠিয়েছি এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন কর। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬)

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

অর্থঃ তারা ত্বাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ত্বাগুতকে অমান্য করে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬০)

যারা ত্বাগুতী নেতা-কর্মী ও সমর্থকদেরকে ত্বাগুতী রাজনীতি বর্জন করার নির্দেশ দেয়না; বরং গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদে বহাল রেখেই নিজ নিজ জামাআ'তে অন্তর্ভূক্ত করে তাদেরকে সাথে নিয়ে সমাজ সংস্কার ও সমাজ বিপ্লব করে বেড়াচ্ছেন, জানিনা তাদের বিপ্লবোত্তর সমাজ কেমন হবে? রাষ্ট্রীয়ভাবে কি তাদের ইসলামী আইনের প্রয়োজন হবে না? অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজ হাতে গড়া সমাজের লোকদেরও চুরির দায়ে হাত কাটার জন্য এবং ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন হয়েছিল। অতএব রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে না নিয়ে তারা কিভাবে আল্লাহর এ বিধানগুলো পালন করবেন?

৩. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিঃ এ আকীদা গ্রহণকারীগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় গিয়ে দ্বীন কায়েম করতে চান। সে মতে তারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মেজোরিটি পার্সেন্ট ভোটের প্রয়োজন হয়। কাজেই ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, নাস্তিক, মুরতাদ সকলেরই সমর্থন নিতে হবে। অতএব আল কুরআনে বর্ণিত জিহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করে বাতিল সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টা চালানো যাবেনা। তাদের নিকট বর্তমান যুগে ভোট যুদ্ধই প্রকৃত ইসলামী যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমেই ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করা সম্ভব।

এসব মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের জানা দরকার যে, এ পদ্ধতিটি আদৌ কোন সুন্নাতী পদ্ধতি নয়; বরং নিঃসন্দেহে এটি একটি কুফরী পদ্ধতি। শিক্ষিত সমাজ অবগত আছেন যে, এ পদ্ধতিটি আল্লাহর নির্দেশিত বা রসূলের অনুমোদিত নয়; বরং এটা কাফের-মুশরিকদের তৈরী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে এ পদ্ধতির জনক বলা হয়।

তাদের একটু চিন্তা করা দরকার, কুরআনে বর্ণিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে কাফের-মুশরিকদের তৈরী পদ্ধতি কিভাবে ইসলাম কায়েমের জন্য সহায়ক হবে? অথচ কাফেররা এ পদ্ধতিটি এ জন্যই তৈরী করেছে যাতে করে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসা চিরতরে বন্ধ করা যায়। কাফেররা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে কোন দিনই বিজয়ী হতে পারেনি। কারণ মুসলমানগণ যুদ্ধ করে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এ পথে শহীদ হলে জান্নাত পাওয়া যাবে। আর কাফেররা যুদ্ধ করে এই মন মানসিকতা নিয়ে যে, মরে গেলে দুনিয়ার ভোগ বিলাস সব কিছুই হারাবে। তাই গবেষণা করে উদ্ভাবন করেছে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার রক্তপাতহীন এক নতুন কৌশল।

কাফেররা বুঝতে পারে যে, এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটি মুসলমানদের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারলে ঈমানদার মুসলমানরা কখনো শাসন ক্ষমতায় যেতে পারবে না। এর ফলে পৃথিবী হতে ইসলামী শাসন বিলীন হয়ে যাবে, আর এটাই শয়তানের কামনা। এ জন্য জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান তাদের দেখানো ভ্রান্ত পথগুলো মুমিনদের মানসপটে সুন্দর রূপ দিয়ে উপস্থাপন করে এবং সেই পথে কাজ করার প্ররোচনা দেয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

অর্থঃ শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। অতএব তারা সৎপথ পায়না। (সূরা নামল ২৭ ঃ ২৪)

অনুরূপভাবে, কাফের-শয়তানরা ভোটের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী লোকদেরকে এভাবে বুঝাচ্ছে যে, যদি এই পদ্ধতিতে ধৈর্যের সাথে মেহনত করতে থাক, তবে বিনা রক্তপাতে তোমরাও একদিন ইসলামী শাসন কায়েম করতে পারবে। যেমন নাকি এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মতবাদ কায়েম হয়েছে। কাফেররা তাদের ভোটের পদ্ধতিটি এত সুন্দর করে তুলে ধরার আরেকটি কারণ এই যে, তারা এটা ভালো করেই জানে, শয়তানের দল সব সময়ই ভারী হবে। সুতরাং তাদের মতো বৃহৎ শয়তানদের ক্ষমতায় আসার জন্য এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত ফলদায়ক। যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা কখনও

ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কেননা অধিকাংশ মানুষের কাছে ইসলামী অনুশাসন পছন্দ হয় না।

তবে হ্যাঁ ইসলামের নামেও ক্ষমতায় আসা যাবে। যদি হিকমতের দোহাই দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধকে ছাড় দেয়া যায় আর দেশীয় ত্বাগুতদের সাথে শামিল হওয়া যায়, তাহলে ত্বাগুতী সংসদের এমপি/মন্ত্রীত্বও পাওয়া যাবে। কিন্তু শর্ত এই যে, ইংরেজ ত্বাগুতদের বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে এবং দেশী-বিদেশী কাফের-মুশরিকদেরকে বোঝাতে হবে যে আমরা মৌলবাদী কট্টরপন্থী নই; বরং আমরা বিশ্ব গণতন্ত্রায়নের পক্ষে, তাহলে এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসা বৈচিত্র কিছু নয়। কেননা এদেশে ইসলামের নাম নিয়ে মুসলিম লীগও একদিন ক্ষমতায় এসেছিল। তারা মুসলমানদেরকে আলাদা আবাস ভূমির লোভ দেখিয়ে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকারও করেছিল। কিন্তু তাদের দ্বারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ তারা ইংরেজদের মনঃপুত গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে ক্ষমতায় এসেছিল। আজও সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক পন্থায় কোন দল যদি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পায়, তবুও তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করতে পারবেনা। কারণ চোরের হাত কাটতে গেলে, ব্যাভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করতে চাইলে গণতন্ত্রের ধারক বাহকরা বলবে, এগুলো মানবতা বিরোধী আইন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলে বলবে, এটা ব্যাকডেটেড শিক্ষাব্যবস্থা যা বর্তমান বিশ্বে অচল। সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বলবে বিশ্বে তোমরা এক ঘরে হয়ে যাবে, তোমাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে। রেডিও, টিভি, সিনেমা, পার্লার, বিপণী বিতান ও রাস্তাঘাটে অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে চাইলে বলবে এরা ইসলামের নামে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। এদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত কর। এরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে আবার গণতন্ত্র বিরোধী কাজ করতে চায়। তখন কি আপনাদের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং, আন্দোলন, হরতাল, অবরোধ হবে না? কারণ এসব হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক অধিকার। আপনারা কি তখন বলতে পারবেন আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন চলবে না? এমতাবস্থায় বিশ্ব গণতন্ত্রের মোড়লরা কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনাদেরকে সাহায্য করবে? আপনারা কি জানেন না! গণতন্ত্রের মাধ্যমে তারা Globalization বা বিশ্বায়নের নামে পৃথিবী হতে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে চায় এবং আমাদেরকে তাদের গণতন্ত্রের জালে আবদ্ধ করে তারা বিশ্বের সুপার পাওয়ার হতে চায়। আমরা কি আল্লাহর নির্দেশিত জিহাদ-কিতালের রাজনীতি ছেড়ে ইসলামের নামে গণতন্ত্রের রাজনীতি করে বিশ্ব গণতন্ত্রের বুর্যূয়াদেরকে সুপার পাওয়ার হওয়ার সুযোগ করে দেব?

মুসলমানগণ ভারতবর্ষ হতে ইংরেজদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে তদস্থলে ইকামাতে দ্বীনের জন্য সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা করেন। বিভিন্ন সময়ে যারা নেতৃত্ব দেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সাইয়েদ আহমেদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল, এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী, হাফেজ

তিতুমীর (রহঃ) সহ আরও অনেকে। অবশেষে ইংরেজরা যখন বুঝতে পারে যে, তাদের আর এদেশ শাসন করা সম্ভব হবে না, তখন মুসলমানদের মাঝে গণতন্ত্রের বীজ বপন করতে লাগল, যেন তারা চলে গেলেও তাদের রচিত সংবিধান এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ উদ্দেশ্যে কিছু সুবিধাবাদী মুসলমানকে তাদের অনুসারী বানায়। যারা জিহাদ কিতালের ধারা বন্ধ করে এদেশে গণতন্ত্রের ধারা চালু করে। এ কথা ভাবতেও অবাক লাগে তারা মুসলমান হয়ে কীভাবে কাফেরদের রচিত চক্রান্তের জালে পা দিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অধিকাংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন-

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশের মত অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দেবে। (সূরা আনআম ৬ ঃ ১১৬)

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা ইসলাম কায়েম করতে চান, তারা যদি গভীর দৃষ্টি দিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করেন তবে দেখতে পাবেন, অধিকাংশ লোকই সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না।

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

অর্থঃ আমি তোমাদের কাছে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করে। (সূরা যুখরুফ ৪৩ ঃ ৭৮)

এরূপ কথা শুধু দু'এক জায়গায় নয় বরং কুরআন মাজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের পথভ্রষ্টতার দলীল পাওয়া যায়।

وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ তাদের অধিকাংশই ফাসেক। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৮)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থঃ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে, অথচ সাথে সাথে শির্‌কও করে। (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০৬)

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থঃ বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না, অতএব তারা টালবাহানা করে। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৪)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

অর্থঃ অধিকাংশ জিন ও ইনসানকে আমি জাহান্নামের জন্য তৈরী করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল। (সূরা আরাফ ৭ ঃ ১৭৯)

তাহলে যদি অধিকাংশ লোকই নির্বোধ হওয়ার কারণে ইসলামী শাসনকে পছন্দ না করে, তবে গণতান্ত্রিক পন্থায় কিভাবে দ্বীন কায়েম হবে? তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করাও যায় যে, অধিকাংশের সমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় গিয়ে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব হবে, তারপরও গণতান্ত্রিক পন্থায় দ্বীন কায়েম করার অপরাধে আল্লাহর নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো দ্বীন কায়েমের জন্য একটি পদ্ধতি দিয়েছেন, তা পরিত্যাগ করে মানব রচিত কোন পদ্ধতিতে দ্বীন করার অনুমতি তিনি কাউকে দেননি। অতএব কাফেরদের তৈরী করা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

ভোটের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী লোকেরা কাফের-মুশরিকদের চক্রান্ত বুঝতে পারেনি, আসলে কাফেররা মুমিনদেরকে নিরস্ত্র করে তারা অস্ত্রে সমৃদ্ধ হতে চায়, যাতে একযুগে আক্রমণ চালিয়ে দুনিয়া হতে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন-

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

অর্থঃ কাফেররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র শস্ত্র ও মাল সামান হতে গাফেল থাক, যাতে (অসতর্ক মুহুর্তে) তারা একযোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে।

(সূরা নিসা ৪ ঃ ১০২)

দ্বীন কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রশিক্ষণ নিলেই মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী, মৌলবাদী আখ্যা দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশস্ত্র জিহাদ করেছেন এজন্য কাফেররা তাঁকেও সন্ত্রাসী বলেছে। একবার বিশেষভাবে ভেবে দেখুন! মুমিনদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ না থাকলে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলেও তারা কি সে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? দেশী-বিদেশী ইসলাম বিরোধী শক্তি আক্রমণ করে মুহূর্তের মধ্যেই সেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু মুমিনরা প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্রে সজ্জিত থাকলে তারা ঈমান ও রাষ্ট্র হেফাজতে সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। তাতে হয় শহীদ হবে নয়ত বিজয়ীর বেশে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ও অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। আর এ

দ্বীন কায়েমের বিষয়টি জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-নাচাওয়ার উপর নির্ভর করেনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

অর্থঃ তারা কি আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য জীবন ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সব তাঁরই অনুগত। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৮৩)

আসমান ও জমিনে সবই আল্লাহ তা'আলার অনুগত হলেও গণতন্ত্রের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী লোকেরা তাঁর অনুগত হতে পারছেন না। কারণ তারা আল্লাহর দেয়া পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যার ফলে তারা কাফেরদের তৈরীকৃত সংবিধান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

অর্থঃ অথচ নিঃসন্দেহে তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং মুসলমান হবার পর কুফরী করেছে। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৭৪)

তাই দেখা যাচ্ছে বর্তমানের এমপি ও মন্ত্রীবৃন্দ সংসদে গিয়ে মানব রচিত সংবিধান বাস্তবায়নের শপথ বাক্য উচ্চারণ করে কাফেরে পরিণত হচ্ছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল অথবা কুফরী কাজ করল তজ্জন্য সে কাফেরে পরিণত হলো, যদিও এ কথা বা কাজের দ্বারা তার কাফের হওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে। কেননা কেউই কাফের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না, তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে চান।"[১]

অতএব, যে ব্যক্তি দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে মানব রচিত সংবিধান বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করল, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট কুফরী করল। এরপর ঐ ব্যক্তি যদি তার ভূল বুঝতে পেরে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় এবং সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু তা না করে সংসদ সদস্য হিসেবে সে তার দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং হিকমতের দোহাই দিয়ে মানব রচিত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিল এর ফলে সে শির্ক করল অর্থাৎ আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বে মানুষের শাসন শরীক করল। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[১] 'শরীয়তের দৃষ্টিতে অজ্ঞতার ওজর' নামক গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য প্রকাশনায়ঃ দারুন হামাযী রিয়াদ, সৌদি আরব।

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থঃ আল্লাহ তার শাসন কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না। (সূরা কাহাফ ১৮ ঃ ২৬)

গণতন্ত্রের পক্ষে দলীল দিতে গিয়ে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ উমর, ওসমান ও আলী (রাঃ) এর আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন পদ্ধতির প্রসঙ্গ টানেন। অথচ তাঁরা আমীর নির্বাচিত হয়েছিলেন কয়েকজন তাকওয়া সম্পন্ন ঈমানদারের পরামর্শের (শূরার) ভিত্তিতে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুধু কয়েকজন ঈমানদারের ভোটে নেতা নির্বাচিত হবে না; বরং এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট ভোট চাইতে হবে কিন্তু মুসলিমদের নেতা নির্বাচনে কোন অমুসলিম রায় দিতে পারে না। অথচ গণতান্ত্রিক নিয়মে মুসলিম-অমুসলিম, ভাল-মন্দ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ঈমানদার-বেঈমান, বিবেকবান-বোকাসহ দেশের সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার রয়েছে এবং এদের সবার ভোটের মান সমান। তাহলে গণতন্ত্রের সাথে ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ) এর আমীর নির্বাচিত হওয়ার সামঞ্জস্য কিভাবে হলো?

তাছাড়া আমাদের তো এখন আমীর নির্বাচনের প্রেক্ষাপট নয়; বরং এ দেশে এখন দ্বীন কায়েমের প্রেক্ষাপট। দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি ও আমীর নির্বাচনের পদ্ধতি কখনও এক নয়। দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হচ্ছে কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) এবং আমীর নির্বাচনের পদ্ধতি হচ্ছে মুত্তাকীদের দ্বারা গঠিত শূরায়ী পদ্ধতি। সুতরাং এখন দেখতে হবে আমাদের দেশে দ্বীন কায়েম আছে কিনা, যদি তা না থাকে তাহলে আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের তরীকা অনুযায়ী কিতালী পদ্ধতিতে এ দেশে দ্বীন কায়েম করতে হবে। অতএব আমরা তো একথা বলছিনা যে, ইসলামী দলের আমীর নির্বাচন করার জন্য কিতাল শুরু করুন; বরং একথা বলছি যে, শুরায়ী পদ্ধতিতে আমীর নির্বাচন করে তারই নেতৃত্বে দ্বীন কায়েমের জন্য কিতাল করুন এবং এ কিতালই হচ্ছে দ্বীন কায়েমের একমাত্র পদ্ধতি।

কোন আমল কবুল হওয়ার শর্ত হলো তা আল্লাহর নির্দেশ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা অনুযায়ী হতে হবে, তা না হলে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অর্থঃ হে মুমিনগণ আল্লাহ ও রসূলের অনুসরণ কর আর (এরূপ না করে) তোমাদের আমলগুলোকে বিনষ্ট কর না। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ৩৩)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ যে কর্মের ব্যাপারে আমাদের (কুরআন-হাদীসে) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[১]

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪৩৮৫, ইফাবা হাঃ ৪৩৪৪, ইসে হাঃ ৪৩৪৪।

কোন কোন দলের নেতাগণ বলেন- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কুফরী পদ্ধতি হিসাবেই জানি কিন্তু আমরা তো এ পদ্ধতি কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করেছি। এখন বিবেকবান ঈমানদারগণের নিকট প্রশ্ন, স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে কিছু সময়ের জন্য কুফরী করা কি জায়েয আছে? আবার কেউ এ কুফরী পদ্ধতিকে হিকমত হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। তাই তারা কিতালকে ফরজ জেনেও তা বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় দ্বীন কায়েম করতে চাচ্ছেন এবং হিকমতের নাম করে কিতালের প্রশিক্ষণ নেয়া থেকে বিরত থাকছেন। তাই সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ পরিত্যাগ করা কি হিকমত? নাকি প্রকাশ্যে সম্ভব না হলে গোপনে প্রশিক্ষণ নেয়া হিকমত? কোন বিধর্মী এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানের জন্য সলাত পড়া যদি বিপজ্জনক হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করা কি হিকমত? নাকি প্রকাশ্যে পড়তে না পাড়লে গোপনে পড়া হিকমত?

যারা এ ধরণের হিকমতের কথা বলছেন তাদের নেতা কর্মীগণ কি সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? বিগত কয়েক যুগে তাদের কতজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুজাহিদ তৈরী হয়েছে? তারা কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ করে শহীদ হতে চান?

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। আমি কামনা করি আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করতে করতে যেন শহীদ হয়ে যাই। অতঃপর, আমাকে জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ করেছেন এবং এ পথেই বার বার শহীদ হতে চেয়েছেন। সেই পথ পরিত্যাগ করে যারা গণতন্তের পথ গ্রহণ করেছেন এবং এ পথেই যুগ যুগ ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা নিজেরাও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছেন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকেও গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

৪. গণ-অভ্যুত্থানঃ অনেকে মনে করেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গণ-অভ্যুত্থান শরীয়তসম্মত। মিছিল-মিটিং করে, আইন অমান্য করে, গুলির মুখে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যে অভ্যুত্থান ঘটবে তা ইসলাম কায়েমের জন্য হবে পুরোপুরি উপযুক্ত।

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ২৭৯৭, ইফাবা হাঃ ২৬০১।

জানিনা যারা খাঁটি ইসলামের পক্ষে এরূপ গণ-অভ্যুত্থানের আকাশ কুসুম কল্পনা করেন, মস্তিষ্কের দিক থেকে তারা কতটা সুস্থ রয়েছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই যদি ইসলাম কায়েম সম্ভব না হয়, তবে গণ-অভ্যুত্থান পদ্ধতিতে কিভাবে ইসলাম কায়েম হবে?

স্বপ্ন দেখতে কেউ নিষেধ করতে পারেনা, তবে জেগে উঠলে স্বপ্নের কোন দৃশ্যপটই আর বাস্তব থাকে না। গণ-অভ্যুত্থান ঘটানোর স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে দেখতে পাবেন বাস্তবতা কত কঠিন কারণ প্রকৃত দ্বীন কায়েম করার জন্য ফাসেক-বিদআ'তী ও মুনাফিক মুরতাদরা কখনও গণ-অভ্যুত্থান করতে পারে না। যে দ্বীন কায়েম হলে শিরক বিদআ'ত, গান-বাজনা, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা, অশ্লীলতা-নগ্নতা, বিজ্ঞাপনের নামে নারী দেহ প্রদর্শনী, প্রগতির নামে নারী ভোগের নানা কৌশল ইত্যাদি সব বানচাল হয়ে যাবে। সেই দ্বীন কায়েমের জন্য তারা কখনো গণ-অভ্যুত্থান করতে পারেনা।

তবে কোন জাতীয় চেতনায় বা সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্বের জন্য অথবা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গার জন্য গণ-অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। যেমন নাকি ইরানে শীয়ারা সুন্নীদের বিরুদ্ধে ঘটিয়েছিল। যার ফলে সেখানে অনেক সহীহ আমল আকীদাহ ধ্বংস হয়ে শীয়াঈ বাতিল আকীদার ভিত্তি মজবুত হয়েছে। তারা সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন ও তিন খলিফাসহ অধিকাংশ সাহাবীদের কাফের আখ্যা দিয়েছে এবং কুরআনের পরিবর্তন সাধন, মুতা বিবাহ বৈধকরণ ইত্যাদি ইসলাম ধ্বংসকারী মতবাদ চালু করেছে। তাছারা এরূপ কোন নিরস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারা দ্বীন কায়েমের পক্ষে ইসলামের কোন দলীল নেই। শরীয়ত সম্মতভাবে প্রশিক্ষণ না নিয়ে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হয়ে বিনা অস্ত্রে হৈ-হুল্লোড় করে গণ-অভ্যুত্থানের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দেন নাই।

অভ্যুত্থান যদি করতেই হয় তাহলে একদল যুবকের আমল আকীদা পরিশুদ্ধ করে তাদের দ্বারা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে হবে। যেভাবে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবী তৈরী করে তাদের দ্বারা সশস্ত্র পন্থায় দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এ পদ্ধতিকে কুরআনের ভাষায় 'কিতাল' বলা হয়। দেশের প্রতিটি শহর-বন্দরে অলিতে-গলিতে ও গ্রাম-গঞ্জে নির্ভীক মুজাহিদীন গ্রুপ তৈরী করতে হবে। যাদের কাছে থাকবে উপযোগী অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। তারা নিজেরা ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হবে এবং সমাজ হতে ইসলাম ধ্বংসকারী মুরতাদদেরকে খতম করে সমাজের দায়িত্বভার হাতে তুলে নেবে। এভাবে অসি ও পেশী শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিয়ে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করবে। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হয়তো অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে না।

কারণ ইসলামের জন্য চিরদিন অল্প সংখ্যক লোকই নিবেদিত থাকে। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যেমন অল্প সংখ্যকের কুরবানীর দ্বারা দ্বীন কায়েম হয়েছিল, শেষ যুগেও অল্প সংখ্যক

ঈমানদারের আত্মত্যাগের দ্বারাই দ্বীন কায়েম হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

অর্থঃ অল্প সংখ্যকের দ্বারাই ইসলামের সূচনা হয়েছিল। অল্প সংখ্যকের দ্বারাই আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সৌভাগ্য অল্প সংখ্যকদের জন্যই।[১]

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে জিহাদী কাফেলা তৈরী করা বাদ দিয়ে গণতন্ত্র, গণ-অভ্যুত্থানের মতো এসব পদ্ধতি দ্বারা ইসলাম কায়েমের জন্য আমরা যেন ব্যস্ত হয়ে না যাই এবং কুরআনের দেখানো রাস্তা ছাড়া অন্য কোন চাকচিক্যময় পথের উজ্জলতায় যেন মোহগ্রস্থ হয়ে না পড়ি।

দ্বীন কায়েমের সঠিক আকীদা হচ্ছে কিতালঃ

বর্তমানে আমাদের সমাজে দ্বীন কায়েমের জন্য উপরে উল্লেখিত চার ধরণের লোক দেখা যায়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে উক্ত আকীদাগুলোর সপক্ষে কোন দলীল প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও হাদীসে এই দলীলই পাওয়া যায় যে, দ্বীন কায়েমের আকীদা হচ্ছে কিতালী পদ্ধতি। অতএব আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস এটাই হওয়া উচিত যে, এই কিতালী পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম সম্ভব নয়। দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থঃ আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩৯)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সাধারণ দাওয়াত দেননি, দাওয়াতের সাথে সাথে অগ্রাহ্যকারীদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (জিজিয়া প্রদান, নয়তো সশস্ত্র মুকাবেলার পথ) গ্রহণ করেছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অবিরাম সশস্ত্র জিহাদ করে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ভাবেই দ্বীন কায়েম হবে তার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

---

[১] সহীহ মুসলিম ২৬৭, ইফাবা হাঃ ২৭০, ইসে হাঃ ২৮০।

لَنْ يَّبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

অর্থঃ চিরকাল এ দ্বীন কায়েম থাকবে এবং তা কায়েমের জন্য মুসলমানদের মধ্যে ছোট একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে।[১]

দ্বীন কায়েমের জন্য এই একটি মাত্র পদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়।

কিতালী পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ তা'আলা তিন দফা কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলেছেন। কর্মসূচীগুলো নিম্নরুপঃ

১ম দফাঃ تَحْرِيْضٌ উদ্বুদ্ধকরণ- কিতালের জন্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনুভূতি জাগ্রতকরণ এবং মুমিনদেরকে এ জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

অর্থঃ হে নাবী, আপনি মুমিনদেরকে কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৬৫)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করতে থাকুন। আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কারোর জিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদেরকে (সশস্ত্র জিহাদে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৮৪)

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْف

অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখ, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নিচে।[২]

২য় দফাঃ قُوَّةٌ শক্তি অর্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ- কিতালের পূর্বশর্ত হিসেবে আল্লাহ তা'আলা প্রশিক্ষণগ্রহণকে ফরজ করেছেন।

---

[১] সহীহ মুসলিম, ইসে. হাঃ ৪৮০১।

[২] সহীহ বুখারী ২৮১৮, ইফাবা হাঃ ২৬২০।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থঃ আর প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৬০)

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

অর্থঃ আর যদি তারা যুদ্ধে বের হওয়ার সংকল্প নিত তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৪৬)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশিক্ষণ বিহীন ক্বিতালে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাঁর উম্মতদেরকে নির্দেশ দেন নাই। আরবগণ জাত যোদ্ধা হলেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কিতালের জন্য বিশেষ ভাবে ট্রেনিং দিয়েছেন। খোলা বাজারে তীর চালানোর প্রতিযোগিতা এবং ঘোড়দৌড় প্রশিক্ষণ করিয়েছেন।

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ

وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ

অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুকৃত ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতা করিয়েছেন হাফিয়া নামক স্থান থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত।[১]

إِرْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

অর্থঃ হে ইসমাঈলের বংশধর! তীরন্দাজী কর (অর্থাৎ তীর চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর), কেননা তোমাদের পূর্ব পুরুষ ভাল তীরন্দাজ ছিলেন।[২]

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বহু দেশ বিজয় করিয়ে দিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ। অতএব তোমাদের মধ্যে যেন কেউ তীর খেলা তথা জিহাদী প্রশিক্ষণ নিতে অপারগতা প্রকাশ না করে।[৩]

---

[১] সহীহ বুখারী ২৮৬৯, ইফাবা হাঃ ২৬৬৯, মুসলিম ৪৭৩৭, ইফাবা হাঃ ৪৬৯০, ইসে হাঃ ৪৬৯১।

[২] সহীহ বুখারী ২৮৯৯, ইফাবা হাঃ ২৬৯৬।

[৩] সহীহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭৯৪, ইসে হাঃ ৪৭৯৫।

একজন মুসলিমের জন্য বাজে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা না করে বরং সশস্ত্র প্রশিক্ষণের প্রতিযোগিতা করা উচিত, যাতে করে সে এ বিদ্যায় পূর্ণ পারদর্শী হতে পারে এবং আল্লাহর শত্রুকে সহজেই পরাস্থ করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। সাহাবীগণ মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাই তাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র না থাকলেও প্রশিক্ষণের কোন কমতি ছিল না।

কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রকাশ্যে প্রশিক্ষণ নিতে না পারলে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে গোপনে হলেও প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এ দেশে গোপনে যতটুকু সম্ভব তাতো নিতেই হবে, এ জন্য যদি বিদেশে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাও যেতে হবে। অতএব প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে ক্বিতালে নামতে হবে।

৩য় দফাঃ قِتَالٌ فِي سَبِيلِ اللهِ সশস্ত্র জিহাদের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া-

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ

অর্থঃ যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে, আল্লাহর রাহে তাদের সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া তাদের কর্তব্য। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭৪)

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে; এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৪১)

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থঃ আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা সকলে মিলে কিতাল কর সর্বাবস্থায়, আর মনে রেখ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অল্প সংখ্যক বান্দাকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে অধিক সংখ্যকের উপর বিজয়ী করেন।

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ

অর্থঃ সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৪৯)

بَلٰى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমরা যদি ধৈর্য্যধারণ কর এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তবে যে মূহুর্তে শত্রুগণ তোমাদের উপর চরাও হবে ঠিক সেই মূহুর্তে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১২৫)

কিতাল কি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথ?

কতিপয় লোকের ধারণা কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদে নামলে ইসলামী আন্দোলনের ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাদের বক্তব্য হলো, এ পদ্ধতি অবলম্বন করা মানেই দলবলসহ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং তারা এ কথাও বলে যে, আমরা কি আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মতো মজবুত ঈমানদার হতে পেরেছি, যার ফলে সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি?

যারা এরূপ কথাবার্তা বলেন তাদের ইসলামী জ্ঞানের প্রতি করুণা হয়। তারা এতটুকুও বুঝেন না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে তা পালন করা সবার উপর ফরজ হয়ে যায়। আল্লাহর বিধানকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ যে নিয়ম ও পদ্ধতিতে পালন করেছেন, সেই নিয়ম ও পদ্ধতিতে পালন না করে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইয়া রসূলুল্লাহ! মুক্তি প্রাপ্ত দল কোনটি? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন-

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

অর্থঃ আমি ও আমার সাহাবীরা যে নীতি ও আদর্শের উপর আছি, এর উপর যারা থাকবে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল।[১]

অতএব আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণ যেমনিভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ করেছেন ঠিক অনুরূপভাবে আখিরাতের মুক্তিকামীদেরকে জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও সশস্ত্র জিহাদ করতেই হবে।

অথচ তারা বলে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের মতো পরহেজগার না হয়ে কিতালের পথ গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু সলাত, সাওম বা অন্য আমলের ক্ষেত্রে তারা এই অজুহাত দেখায় না যে, নাবী ও সাহাবীদের মতো পরহেজগার না হয়ে সলাত, সাওম শুরু করা যাবে না।

---

[১] সুনানে তিরমিযী, মাদানী প্রকা. হাঃ ২৬৪১।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সিয়াম সাধনাকে যে ভাষায় যে শব্দ দ্বারা ফরজ করেছেন, কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদকেও ঠিক সেই ভাষায় ও সেই শব্দ দ্বারাই ফরজ করেছেন। সাওম ফরজ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা বাকারাহ ২ঃ১৮৩) ঠিক তেমনিভাবে সশস্ত্র জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারেও তিঁনি বলেনঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২১৬)

যারা এই সমস্ত অযুহাত দেখায় তারা সলাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করে না; বরং উল্টো টালবাহানা শুরু করে এবং বলে বেড়ায় যে, এ পথে গেলে দলবলসহ ধ্বংস হয়ে যাব। আমরা ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহর দ্বীনের কাজ কে করবে? দ্বীনী আন্দোলনতো স্তব্ধ হয়ে যাবে!

আসলে এ সবই মনের দূর্বলতা যা তাদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করেছে। এ জন্য তারা বলে, সশস্ত্র জিহাদের পথে পা বাড়ানো মানেই দলবলসহ সমূলে মূলোৎপাটিত হয়ে যাওয়া। এরূপ সংশয় সৃষ্টিকারীগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদীস সম্পর্কেও বেখবর আছেন।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَبِّيْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّيْ أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوٰى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا

অর্থঃ সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- আমার রব আমাকে বলেছেন হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন ফায়সালা করি তখন তা আর পরিবর্তন হয় না। আমি আপনার উম্মতকে এই বিশেষত্ব দান করলাম যে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেবনা এবং তাদের বহিঃশত্রুরা এসে যদি তাদের মূলোৎপাটিত করে দিতে চায়, তবে আমি তা করতে দেবনা। এজন্য পৃথিবীর সকল প্রান্ত হতে যদি ইসলামের শত্রুরা এসে একত্রিত হয়ে আপনার উম্মতকে সমূলে ধ্বংস করতে চাইলেও তা করতে পারবে না।[১]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একটি জামাআ'ত কিতাল করতে গিয়ে সবাই শহীদ হয়ে গেলেও গোটা উম্মত ধ্বংস হচ্ছেনা।

---

[১] সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী ২২৬৭, মাদানী প্রকা. হাঃ ২১৭৬; হাদীসটি হাসান-সহীহ।

তাহলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে এরূপ গায়েবী ইল্‌ম বর্ণনা করা একজন মুসলমানের জন্য কতটুকু সংগত হবে? কোন একটি বিশেষ দল কি আল্লাহর নিকট থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ইজারা নিয়েছে যে তাদেরকে বেঁচে থেকেই এ আন্দোলন মূল টার্গেটে পৌছে দিতে হবে?

তারা কি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়াই নিজ ক্ষমতায় কোন কাজের সফলতা লাভ করা যায়? যদি তা না পারা যায় তবে কেন বেঁচে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করে? তবে কি সশস্ত্র জিহাদের পথ বেছে নিলেই সমূলে শেষ হয়ে যাবে আর সশস্ত্র জিহাদ না করলেই বেঁচে থাকবে? আসলে শয়তান এ সংশয় মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়, আর মানুষ বাহানা হিসাবে তা উপস্থাপন করে মাত্র, যার কোন প্রামাণ্য ভিত্তি নেই।

সমূলে ধ্বংস হওয়া না হওয়া আল্লাহর হাতে। তাক্বদীরে যারা বিশ্বাসী তারা কখনই এরূপ কথা বলতে পারে না। এরূপ কথা বলেছিল বনী ইসরাইল জাতি। মুসা (আঃ) এর উম্মত বনী ইসরাইলের উপর যখন কিতাল ফরজ করা হয়েছিল তখন বনী ইসরাঈলরাও বলেছিল, আমরা দ্বীন কায়েমের জন্য এই অবস্থাতে ক্বিতালে নামলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাব। কেননা আমাদের প্রতিপক্ষ বিশাল আকারের এবং অসীম শক্তির অধিকারী। তাই তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করে আমাদের এই ইসলামী আন্দোলনের ধারাকে স্তব্ধ করে দিতে পারিনা। তারা তখন মুসা (আঃ) কে বলেছিল, এরূপ বোকামী আপনি চাইলে করুন কিন্তু আমরা তা করতে পারব না।

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ

অর্থঃ অতএব আপনি আর আপনার প্রতিপালক যান এবং তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা মায়েদা ৫ ঃ ২৪)

বানী ইসরাঈল জাতি এরূপ কথা বলে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিল। কিতাল না করার অপরাধে চল্লিশ বৎসর গজব মাথায় নিয়ে তারা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের মুনাফিক-বেঈমানরাও এরূপ কথা বলত। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন এবং মুমিনদের নসীহত করেছেন যে, তাদের মতো মন্তব্য করে তোমরাও কাফের হয়ো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوْا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوْا

غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِي

وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মতো হয়োনা যারা কাফের হয়েছে, নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায় তখন তাদের সম্পর্কে বলে তারা যদি আমাদের সাথে থাকত তবে অভিযানেও মরত না এবং জিহাদেও নিহত হত না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে এরূপ বিশ্বাস দ্বারা (সমস্ত জীবন) অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারেন। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দেখেন। আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যু বরণ কর তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সেসব কিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৫৬ - ১৫৭)

দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদের পথ গ্রহণ করলে কেহ কেহ বলে তোমরা এ কোন ভয়ংকর পথ গ্রহণ করেছ। এতে তোমাদের জেল-জুলুম, নির্যাতন এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। যারা ঈমানদারদেরকে এরূপ ভীতি প্রদর্শন করে তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন-

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অর্থঃ ওরা হলো সেসব লোক যারা (ঘরে) বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত তবে নিহত হতনা। তাদেরকে বলে দিন এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও যতি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

(সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৬৮)

এ যুগে কিতালের পদ্ধতি কি উপযোগী?

অনেকের ধারণা এ যুগে কিতালের পদ্ধতি উপযোগী নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আমাদের ভৌগলিক অবস্থান এমন নয় যে, দ্বীন কায়েমের জন্য এদেশে কিতালের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ সকল সংশয় সৃষ্টি না করে একটু ভেবে দেখা দরকার যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কিতাল শুরু করেন, তখন তাঁর দেশের চতুর্দিকেও শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল।

কোন দিকে পালানোর পথ ছিল না বা কারোর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির কোন আশাও ছিল না। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন কিতালকে ফরজ করেছেন এবং কিতালের আয়াত নাযিল হওয়ার পর অন্য কোন আয়াত দ্বারা এই আদেশ মানসুখও হয়নি, এমতাবস্থায় কোন দলীলের ভিত্তিতে তারা এমন কথা বলতে পারেন যে, কিতাল এ যুগের জন্য উপযোগী নয়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিতালের আয়াতের প্রতি আমল করে নিজে ২৭টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং কিতালী পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম করতে হবে এ মর্মে নির্দেশও দিয়েছেন।

এ সব আয়াত বা হাদীসের কোন যুগের বা কোন ভূ-খন্ডের বা কোন পরিবেশ পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে বাতিল করে দেয়া যাবেনা অথবা এর পরিবর্তে এমন কোন আয়াত বা হাদীসও নেই যে, কখনো কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান অনুপযোগী হলে কিতাল ব্যতিরেকে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করা যাবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর প্রায় সাড়ে তেরশত বৎসর পর্যন্ত দ্বীন কায়েমের জন্য কেউ কিতালী পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই। উক্ত সময়ের মধ্যে এ মর্মে কেউ কোন ফাতওয়া দেন নাই যে, কিতাল ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা জায়েয। বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের যে প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তা আজ থেকে মাত্র ষাট/সত্তর বছর পূর্বে ইংরেজ শাসনামলে তাদেরই চক্রান্তে এ পদ্ধতির সূচনা ঘটে।

অতএব যারা দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর বিধান ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতিকে বর্তমান যুগে উপযোগী মনে করে না এবং এ পদ্ধতিকে সঠিক জেনেও তা গ্রহণ করতে অপারগ এরূপ ভীরু প্রকৃতির লোকদের দ্বীন কায়েমের ময়দানে আসা উচিত নয়।

বোখারা সমরকন্দে মুসলমানদেরকে যখন রাশিয়ান কমিউনিজমের লাল ফৌজ যমদূতের ন্যায় গ্রাস করতে আসে, তখন সে দেশের আলেম-ওলামাগণ সশস্ত্র জিহাদের দ্বারা তাদেরকে প্রতিহত না করে মসজিদ-মাদ্রাসাতে জালালী খতম পড়ে আল্লাহর দরবারে দ্বীন হেফাজতের জন্য দোয়া করতে লাগল। তাদের অস্ত্র নাই প্রশিক্ষণ নাই এমতাবস্থায় সশস্ত্র জিহাদ করে টিকে থাকতে পারবে কি পারবেনা এই ভাবতে ভাবতে মুসলমানেরই বংশোদ্ভূত কার্লমার্কস ও লেলিনের শিষ্যরা সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝড়ের গতিতে আক্রমণ করে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ইসলামী হুকুমতকে তছ-নছ করে দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস করে, ইমাম বুখারীর ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশ বোখারা সমরকন্দে কমিউনিষ্টদের এক বিশাল সাম্রাজ্য কায়েম করে। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত মুসলমানদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ না থাকলে কি অবস্থা হয়।

আসলে যারা এরূপ কিতালের উপযোগিতা নিয়ে পরিবেশ ও ভৌগোলিক প্রতিকূলতার প্রশ্ন উঠান তারা পানিতে না নেমেই মাছ ধরতে চান। যদি তারা সংশয় ঝেড়ে ফেলে কিতালের দিকে এগিয়ে আসতেন তবে দেখতেন পদে পদে আল্লাহর রহমত তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। বস্তুতঃ কিতাল বিমুখ লোকেরা চিরদিনই কিতালকে অসম্ভব মনে করেছে এবং আল্লাহর কাছে কামনা করছে যে, হে আল্লাহ এই প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে কেন আমাদের উপর কিতালকে ফরজ করলে? কিতালকে বিলম্বিত করে দ্বীন কায়েমের জন্য অন্তর্বতীকালীন উপযোগী অন্য কোন পন্থা যদি আমাদের দিতে!

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা এই অবস্থায় কেন আমাদের উপর কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) ফরজ করলে। আমাদেরকে কেন আর কিছুকাল অবকাশ দিলেনা। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭৭)

পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, অবস্থা যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন, ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে মৃত্যুর ভয়ে কিতাল পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

অর্থঃ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরে অবস্থান কর। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭৮)

মৃত্যু যেহেতু একদিন আসবেই তাহলে কিতাল করতে গিয়ে তথা আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করতে গিয়ে আমরা সবাই যদি শহীদ হয়ে যাই তাতে ক্ষতি কি? বরং এতো চরম সৌভাগ্য । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ আর যারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ করবে অতঃপর চাই নিহত হোক বা বিজয় লাভ করুক উভয় অবস্থাতেই আমি তাদের মহাপুরস্কারে ভূষিত করব। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭৪)

ভোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে কিতালের ফরজিয়াত কি আদায় হয়ে যাবে?

কিছু কিছু লোক ভাবছে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে কায়েমের জন্য ভোট যুদ্ধের মতো একটি নিরাপদ ও রক্তপাতহীন যুদ্ধে অংশ নিলে জিহাদ তথা কিতালের ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে। আর এ ফরজিয়াত আদায়ের মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই কুরআন মাজীদে উল্লেখিত সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ

নেওয়ার প্রয়োজন নাই এবং সশস্ত্র জিহাদ করারও প্রয়োজন নাই। মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তব জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে সশস্ত্র জিহাদ করেছেন ও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, এই আধুনিক যুগে এসব অচল; বরং যুগের বাস্তবতায় ভোটযুদ্ধ তথা গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

উপরোক্ত যুক্তিগুলো একেবারেই অবান্তর। বস্তুতঃ মুসলমানদের জন্য কেবল কুরআন-হাদীসই সকল যুগের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই মানব চিন্তার সীমিত পরিধিতে কাল্পনিক রূপরেখাকে যুগের বাস্তবতা বলে আখ্যা দেয়া যায় না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো কুরআন-হাদীসে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে দ্বীন কায়েমের জন্য যে সশস্ত্র জিহাদের নমুনা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষার পদলেহী পন্ডিতদের ব্যাখ্যা করা ব্যালটযুদ্ধ বা ভোটযুদ্ধের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমতাস্থায় কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত সশস্ত্র জিহাদকে পরিত্যাগ করে ভোট যুদ্ধে অংশ নিলে কোনক্রমেই কিতালের ফরজিয়াত আদায় হবে না।

কালিমা পড়া মুসলমানের বিরুদ্ধে কিতালঃ

আজ কিতালের কথা বললেই প্রশ্ন উঠে, সমাজে সবাইতো কালেমা পড়া মুসলমান কার বিরুদ্ধে কিতাল করব? এ ধরণের সংশয় মূলক কথাবার্তা তুলে তারা বুঝাতে চান যে, মুনাফিক-মুরতাদ এসব শুধু নাবী-রসূলগণের যুগে ছিল, এ যুগে সবাই কালেমায় বিশ্বাসী পাক্কা মুসলমান তাই এদের বিরুদ্ধে কিতাল করা জায়েয হবে না।

আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, কাফেরদের মধ্য হতে ফাসেক, মুনাফিক ও মুরতাদ তৈরি হয় না; বরং কালেমা পড়া মুসলমানদের মধ্য হতেই এসব তৈরি হয়।

অতএব, মুসলিম আকীদার মানদন্ডে প্রথমে মুমিন, ফাসেক, মুনাফিক ও মুরতাদ এদের সকলের সঠিক পরিচয় জানা দরকার। নিম্নে সংক্ষেপে এদের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ-

মুমিনঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাজিলকৃত সমুদয় অহী (অহীয়ে মাতলুঃ কুরআনের প্রত্যেক আয়াত এবং অহীয়ে গায়রে মাতলুঃ প্রমাণিত প্রত্যেক সহীহ হাদীস)-কে সত্য জেনে অন্তরে বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী সুন্নাতী তরীকায় আমল করে, আর এসবের মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয় এবং নিফাক ও ইরতিদাদে লিপ্ত থাকে না, তাকে মুমিন বলে।

ফাসেকঃ ঐ মুসলিম কে ফাসেক বলা হয়, যে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় অথবা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে এবং যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে ইসলামের বিধানের দিকে ফিরে আসে।

মুনাফিকঃ ঐ মুসলিম নামধারীকে মুনাফিক বলা হয়, যে প্রকাশ্যে ইসলামের কাজ করে কিন্তু গোপনে গোপনে শরীয়তের আদেশ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিষেধ কাজের প্রসার ঘটায়। তাদেরকে সশস্ত্র জিহাদের দিকে আহবান করলে টালবাহানা শুরু করে।

মুরতাদঃ যারা ঈমান আনার পর শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলো প্রকাশ্যে করে বা ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য বিধান প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়। কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে জাহেলী মতবাদ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা মানুষকে আহবান করে তারাও মুরতাদ।

এ যুগে দেখা যাচ্ছে নামধারী অনেক মুসলিমই মুরতাদের দলভূক্ত, এদের মুনাফিক আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দেয়া যায়না, কারণ বর্তমান মুনাফিকরা শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলি শুধু গোপনে করে না; বরং তা প্রকাশ্যে করে, অতএব শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলি প্রকাশ্যে করার কারণে মুনাফিকের পর্যায় অতিক্রম করে তারা মুরতাদে পরিণত হয়েছে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ

অর্থঃ হুজাইফা বিন আল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমানের মুনাফিকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ের মুনাফিক হতেও জঘণ্য, সে সময়ের মুনাফিকরা শরীয়ত বিধ্বংসী তাদের নেফাকী কাজগুলো গোপনে করত, কিন্তু বর্তমানের মুনফিকরা শরীয়ত বিধ্বংসী তাদের নেফাকী কাজগুলো প্রকাশ্যে করছে। এতে ঈমান আনার পর কুফরী করা হচ্ছে।[১]

পরবর্তী হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

অর্থঃ আর এখন তা (নিফাক) হলো ঈমান গ্রহণের পর কুফরী।[২]

ঈমান আনার পরে যারা কুফরী করে তারা মুরতাদ। কোন কোন ক্ষেত্রে মুরতাদদেরকে তাওবা করার সুযোগ দিতে হয়, আবার বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি হত্যা করতে হয়। অতএব কালেমা পড়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত সবাই ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে না। কেউ তার কর্মকান্ডের দ্বারা মুশরিক হয়, কেউ মুনাফিক হয়, কেউবা মুরতাদ হয়।

---

[১] সহীহ বুখারী ৭১১৩, ইফাবা হাঃ ৬৬২৮।

[২] সহীহ বুখারী ৭১১৪, ইফাবা হাঃ ৬৬২৯।

যারা আল্লাহদ্রোহী কাজকর্মের দরুন মুরতাদে পরিণত হওয়ার পরও নিজেদেরকে মুসলিম ধারণা করে সলাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাদের আদায়কৃত এই সকল ইবাদত দুনিয়া ও আখিরাতে কোনই কাজে আসবে না; বরং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যেখান থেকে তারা আর কোনদিনই পরিত্রাণ পাবে না।

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হবে। আর তারাই হল জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২১৭)

এবার মুনাফিক সম্পর্কে জানা যাক; দেখা যাচ্ছে মুসলিম সমাজে ঈমানদার ও মুনাফিক উভয়ই একই সাথে বসবাস করে। মুনাফিকরা ঈমানদারদের সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে, রমজান মাসে সাওম রাখে, এমনকি একই সাথে হজ্জও করে। এতে করে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করা যায়না। অতএব কে ঈমানদার আর কে মুনাফিক তা জানার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন যুগে যুগে সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা করেন। এতে মুমিনদের উপর যে কষ্ট আপতিত হয়, তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুমেই হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

অর্থঃ আর যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবেলা হয়েছে, সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা এজন্যই যে, তাতে ঈমানদারদেরকে জানা যায় এবং মুনাফিকদেরকে সনাক্ত করা যায়। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৬৬ - ১৬৭)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে যখন সশস্ত্র জিহাদের জন্য আহবান করা হয়, তখনই বোঝা যায়, কে ঈমানদার আর কে মুনাফিক। যারা এ ডাকে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করবে তারাই হলো ঈমানদার। আর যারা টালবাহানা করবে এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সশস্ত্র জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারাই মুনাফিক।

وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ

يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ

অর্থঃ তাদেরকে বলা হলো, এসো আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ কর কিংবা শত্রুদের প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে যুদ্ধ হবে তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা মুখে যা বলে তাদের অন্তরে তা নেই। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন তারা যা কিছু গোপন করে। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৬৭)

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ

وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ

অর্থঃ মুনাফিক নর-নারী একে অপরকে শরীয়তের নিষেধ কাজগুলি করার নির্দেশ দেয় ও শরীয়তের আদেশগুলির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে, তারা আল্লাহকে ভূলে গেছে। কাজেই তিনিও তাদের ভূলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান। আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৬৭ - ৬৮)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ

بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيْلًا - مَلْعُوْنِيْنَ أَيْنَمَا ثُقِفُوْا أُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

অর্থঃ মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৬০ - ৬১)

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দূষ্কর্ম উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে গ্রেফতার করে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। উক্ত আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে এই কারণে যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। এর সাথে শরীয়তের কোন আপোষ নেই। তবে সে তাওবা করে

মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্ম পরস্পর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।[১]

আর যারা লোকদেরকে জাহেলী মতবাদের দিকে আহবান করে তারা 'মুরতাদ'; যদিও তারা সলাত পড়ে, সাওম রাখে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟

قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি জাহেলী মতবাদের দিকে লোকদেরকে আহবান জানায় সে তো জাহান্নামের পচাঁ-গলা লাশ। সাহাবায়ে কিরামগণ জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! যদি তারা সলাত ও সাওম পালন করে তবুও? তিনি বললেন, যদিও সে সাওম রাখে, সলাত পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।[২]

নাস্তিক, মুরতাদ, মুশরিক, ধর্মহীন, সমাজবাদী, নিরশ্বরবাদী ও জাহেলী মতবাদের দিকে আহবানকারী সকল প্রকার কাফের এ সমাজে মুসলমান হিসেবে পরিচিত। শত বুঝানোর পরও আল্লাহর পথ থেকে তারা বিমুখ থাকে; বরং আল্লাহর সত্য দ্বীন ধ্বংস করে মুমিনদেরকেও তাদের অনুরূপ কাফের বানাতে চায়। তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে পবিত্র আল-কুরআনে সরাসরি নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন-

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوْا أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَهْدُوْا مَنْ أَضَلَّ اللهُ

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً فَلاَ

تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ

وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا

অর্থঃ অতঃপর তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? (একদল বলছে এরা কাফের এদেরকে হত্যা করা যাবে, আরেক দল বলছে এরা মুমিন

[১] তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন-১০৯৭ পৃষ্ঠা।

[২] মুসনাদে আহমাদ ১৭২০৯, সুনানে তিরমিযী মাদানী প্রকা. হাঃ ২৮৬৩।

এদেরকে হত্যা করা যাবে না) অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সবাই সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা এবং সাহায্যকারী বানিওনা। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৮৮,৮৯)

কেউ কালেমা পড়ে থাকলে বা উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম দাবী করলেই যে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা যাবে না বা তাকে হত্যা করা যাবেনা এ কথার কোন দলীল নেই। এ সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা কালেমা পড়ার পর ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে বা এমন কোন কাজ করে ইসলামে যার শাস্তি মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে কিতাল চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় এবং সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়, এমনটি করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যদি তারা ইসলামের হক্ব নষ্ট করে যাতে ইসলাম তাকে হত্যা করার অধিকার রাখে, তবে তার রক্ত ও সম্পদ আমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে না। (এরূপ কোন কাজ না করলে) তাদের হিসাব আল্লাহর উপর সমর্পিত হবে।[১]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সলাত, সাওম ঠিকমত পড়ার পরও ইসলামের হক্ব নষ্ট করার অপরাধে কালেমা পড়া ঐ মুসলমানকে হত্যা করতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা সমাজের মুরতাদদেরকেও কালেমা পড়া মুসলমান মনে করি, যা ইসলামী আকীদার মানদণ্ডে মোটেও ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবের প্রখ্যাত মুফতী বিশ্বের অন্যতম ফকীহ শায়খ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাঁর

---

[১] সহীহ বুখারী ২৫, ইফাবা হাঃ ২৪; সহীহ মুসলিম ৩৬, ইফাবা হাঃ ৩৬, ইসে হাঃ ৩৭।

"আল-আকীদাতুস সহীহা" নামক পুস্তিকায় লিখেছেন, একজন মুসলমান তার ইসলাম বিনষ্টকারী কাজের দ্বারা মুরতাদ হতে পারে, যার ফলে তার রক্ত ও সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হালাল হয়ে যায় এবং সে ইসলাম হতে পুরোপুরি খারিজ হয়ে যায়।

এরূপ কাজ অনেক প্রকারের হয়ে থাকে, তন্মধ্যে যে মনে করে-

১. মানব রচিত আইন ও বিধি বিধান ইসলামী আইনের চেয়ে ভাল।
২. ইসলামী আইন এ বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবায়ন করার উপযোগী নয়।
৩. ইসলামী বিধান মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ।
৪. ইসলামী বিধান শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার কাজে সীমাবদ্ধ। জীবনের বাকী কর্মকান্ডে (সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদিতে) এর অনুপ্রবেশ ঠিক নয়।
৫. যাদের ধারণা এই যে, চোরের হাত কাটা ও যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা, এ দু'টি ইসলামী আইন বর্তমান যুগে চলতে পারেনা, এরা সবাই ইসলাম হতে বহিস্কৃত।

অনুরূপভাবে যদি কেউ মনে করে যে, মানব রচিত আইন আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আইনের চেয়ে উত্তম নয় বটে কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা ব্যাবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র চালানো যেতে পারে, তবে সে আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তা হালাল করল। যেমন- যিনা, মদ্যপান, সুদ ও ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকে হালাল করল বিধায় এরূপ ব্যক্তি কাফের ও ইসলাম হতে বহিস্কৃত। এ ব্যাপারে اجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ দেশেতো মুসলিম সরকার, তাহলে কার বিরুদ্ধে কিতাল করব?

কোন মুসলিম সরকার তথা আমীরুল মুমিনীন যদি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তবে কোন অবস্থাতেই তার বিরুদ্ধাচারণ করা যাবে না বা ৫/১০ বৎসর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهٗ زَبِيْبَةٌ مَا أَقَامَ فِيْكُمْ كِتَابَ اللهِ

অর্থঃ আনাস ইব্‌নে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যদি তোমাদের উপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত

করা হয় যার মাথাটি কিসমিসের ন্যায় তবুও তার কথা শুন এবং তার আনুগত্য কর, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের শাসন কায়েম রাখে।[১]

অর্থাৎ কোন মুসলিম সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের শাসন কায়েম রাখবে শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা যাবে। আর যখনই তা পরিত্যাগ করবে তখনই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। কিন্তু এমন কিছু ইসলাম বিরোধী কাজ আছে যা করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা আন্দোলন করে অথবা অন্য কোন সহজ পন্থায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না; বরং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। তাকে জীবিতও ছেড়ে দেয়া যাবে না, তাকে হত্যা করতে হবে। তন্মধ্যে বিষয় হচ্ছে, যদি কোন মুসলিম সরকার তার সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে মুরতাদে পরিণত হয়। তবে এটা তার ঈমান আনার পর কুফরী করা হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

অর্থঃ যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা কর।[২]

আল-ইমামাতুল উযমা গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আবু ইয়ালা বলেনঃ কোন মুসলিম শাসকের দ্বারা যদি ইসলাম বিধ্বংসী কোন কাজ ঘটে তবে এটা তার ঈমান আনার পর কুফরী করা হবে, সে ইসলামী মিল্লাত হতে খারিজ হবে এবং তাকে হত্যা করতে হবে।

কাযী আয়ায (রহঃ) বলেন, যদি কোন মুসলিম শাসক ইসলামী সংবিধানে পরিবর্তন আনে তবে সে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের অধিকার হারায়, তার আনুগত্য করা রহিত হবে, তাকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করে ন্যায়পরায়ণ মুত্তাকী শাসক বসাতে হবে। যদি সে ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলে অস্ত্র ধারণ করে এমন কাফেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা একদল মুমিন এর উপর ওয়াজিব।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেনঃ এমন নামধারী মুসলমান শাসককে অপসারণের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। যারা এরূপ শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করবে, তারা আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবে। আর যারা এ কাজে অপারগ হবে তাদের জন্য ঐ ভূখন্ড হতে অন্যত্র হিজরত করা ওয়াজিব। এরূপ শাসকদের প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন-

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ

[১] সহীহ বুখারী ৭১৪২, ইফাবা হাঃ ৬৬৫৭, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ১৩ খন্ড হাদীস নং ২১।
[২] সহীহ বুখারী ৩০১৭, ইফাবা হাঃ ২৮০৫।

অর্থঃ কিন্তু যদি তারা এমন প্রকাশ্য কুফরী কাজ করে যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে।[১]

এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, “কোন মুসলিম শাসক তার মুরতাদ হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয় যে, সে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে মুরতাদ বা কাফের হতে হবে, বরং তার মুরতাদ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো। যেমন- সরকারীভাবে সুদ নেয়া, পতিতালয় সংরক্ষণ করা, লটারী, মদ, জুয়া ইত্যাদির অনুমতি দেয়া এবং হাদীস দ্বারা ইহাও দলীল সাব্যস্ত হয় যে, একই কিবলার দিকে মুখ করে সলাত আদায়কারীকে কাফের বলা জায়েয। যদিও সে কিবলার অন্তর্গত লোকদের থেকে বের হয়ে না যায় এবং সে ধর্ম পরিবর্তনের ইচ্ছাও না করে। তবুও সে তার কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সংবিধান প্রতিষ্ঠা করার কারণে অবশ্যই কাফের হবে। এমন অবস্থায় যদি ঐ শাসককে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দেয়া না হয় তবে عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য দলীল থাকার পরেও তা অগ্রাহ্য করা হলো। (উপরোক্ত আলোচনা আল ইমামাতুল উয্‌মা ইনদা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ গ্রন্থের ৪৬৮-৪৭০ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত)

কোন শাসক আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র চালানোর কারণে মুশরিক ও মুরতাদে পরিণত হয়ে যায় এরপরও যদি কেউ ঐ শাসককে মুসলমান মনে করে তাহলে সেও কুফরী করল। কারণ কেউ যদি কোন মুসলমানকে কাফের বলে সে যেমন অপরাধী, তদ্রুপ কেহ যদি কোন কাফের, মুশরিক বা মুরতাদকে মুসলমান বলে সেও সমঅপরাধী। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) তাঁর গন্থে نَوَاقِضُ الْإِيمَانُ ঈমান বিনষ্টকারী যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ‘যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করেনা অথবা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে সে কুফরী করল।’[২]

অতএব আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে যারা মানুষের তৈরি করা বিধানে রাষ্ট্র চালায় তাদের চেয়ে বড় মুশরিক আর কেউ হতে পারেনা। পৃথিবীতে যত প্রকারের শিরক চলছে তা কেবল রাষ্ট্রের আইন দ্বারাই উৎখাত করা সম্ভব; ব্যক্তি বা সামাজিকভাবে বল প্রয়োগের দ্বারা তা উৎখাত করা সম্ভব নয়। কারণ ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ তা করতে যায় তবে তা হবে নিজ হাতে আইন তুলে নেয়া, যা হলো রাষ্ট্রীয় অপরাধ।

---

[১] সহীহ বুখারী ৭০৫৬, ইফাবা হাঃ ৬৫৭৮, সহীহ মুসলিম ৪৬৬৫, ইফাবা হাঃ ৪৬১৯, ইসে হাঃ ৪৬২০।

[২] আল আকীদাতুস সহীহা, প্রণেতা শাইখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) পৃঃ নং ২৫।

সেমতে দেখা যাচ্ছে, আজ রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারাই সমস্ত শিরক, বিদআ'ত ও কুফরীর পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে এবং দিন দিন তা কেবল বেড়েই চলছে। তাই কোন শাসক নিজেকে মুসলমান দাবী করলে তার উচিত আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা। কারণ এটা মুসলমানদের উপর ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে বহু আয়াত নাজিল করেছেন। তন্মধ্যে এখানে কিছু উল্লেখ করা হলো-

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ

অর্থঃ আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যা নাজিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন। তাদের প্রভৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৯)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ

অর্থঃ বস্তুত; আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৪)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থঃ অতএব আপনার পালন কর্তার কসম, সে লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের (মামলা-মোকদ্দমার) ব্যাপারে আপনাকে বিচারক মান্য করবে। অতঃপর আপনার দেয়া ফয়সালা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মনে কোন প্রকার আপত্তি থাকবেনা; বরং তা স্বতস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করে নিবে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৫)

এ আয়াতের দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, যদি কোন শাসক আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি করা বিধানে রাষ্ট্র চালায়, তার কোন ঈমান নেই। ঈমান থাকলে সে কখনো আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে মানুষের বানানো আইনে রাষ্ট্র চালাতে পারে না। অতএব, এরকম ব্যক্তি যদি সলাত পড়ে, সাওম রাখে, হজ্জ করে এবং যাকাত দেয় তবে এটা তার বৃথা কষ্ট করা হবে। উক্ত শাসককে আগে এরূপ সংবিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে এবং খালেসভাবে তাওবা করে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করতে হবে। তারপর তার সলাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা ঈমানহীন ব্যক্তির কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয়।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ

بِالْمُؤْمِنِينَ - وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ

অর্থঃ তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করি। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা ঈমানদার নয়। তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল তা উপেক্ষা করে। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৪৭,৪৮)

অর্থাৎ তারা বলে সলাত, সাওমের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করব কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া সংবিধান মানবনা; বরং এক্ষেত্রে ইংরেজদের দেয়া সংবিধান মানব অথবা নিজেরাই সংসদে বসে জনগণের জন্য আইন তৈরী করে দেব।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

অর্থঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর পক্ষে উক্ত বিষয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে ভিন্ন কোন ফয়সালা দেয়ার অধিকার নাই। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬)

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

অর্থঃ তবে কি আমি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন বিচারক (বিধানদাতা) অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব (সংবিধান) অবতীর্ণ করেছেন।
(সূরা আনআম ৬ ঃ ১১৪)

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন কোন বিধান আসার বাকী নেই, যে জন্য কাফের-মুশরিকদের কাছ থেকে বিধান এনে রাষ্ট্র চালাতে হবে বা নিজেদের কোন বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। আমাদের কাজ শুধু আল্লাহর আইন মেনে চলা, আইন তৈরী করা নয়।

অতএব, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ উপেক্ষা করে গণতন্ত্রবাদী শাসক তো দূরের কথা, কোন আমীরুল মুমিনীনও যদি আল্লাহর সংবিধান বাদ দিয়ে নিজের পছন্দমত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র চালায় তবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা

করতে হবে। যারা আল্লাহদ্রোহী ঐ শাসককে হেফাজতের চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে।

ইহুদী, নাসারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অপপ্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ একটা ভূল ধারণা পোষণ করে যে, যারা সশস্ত্র জিহাদের কথা বলে তারা হয়তবা জিহাদ শুরু করলে একদিক থেকে গণহত্যা শুরু করবে এবং সে গণহত্যায় কাফের-মুশরিক, ফাসেক-ফাজের মুসলিম, বৃদ্ধ, শিশু, নারী-পুরুষ নির্বিচারে সবার উপর গুলি চালাবে। আসলে ইসলামী জিহাদে ফাসেক-ফাজের মুসলমানদেরকে হত্যা করা তো দূরের কথা, নিরস্ত্র পুরোহিতদেরকেও হত্যা করার অনুমতি নেই।

জিহাদ কোন সাধারণ কাফেরের বিরুদ্ধে নয়, জিহাদ হচ্ছে কুফরী পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত শাসকদের বিরুদ্ধে। ইসলাম কাফেরকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে কিন্তু মুরতাদ কে কখনই বেঁচে থাকার অধিকার দেয়নি। কোন কাফের যদি ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া দিয়ে বেঁচে থাকতে চায় তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু কোন নামধারী মুসলমানও যদি আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। ফলে তাকে হত্যা করতে হবে।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থঃ আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেনঃ মুসলিম ওলামাগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, যদি কোন রাজনৈতিক দল শরীয়তের প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য কোন বিধান বাস্তবায়নে বাধা দেয় বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যাতে করে আল্লাহর সমস্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[১]

নাবী রসূলগণের ওফাতের পর সে সময়ের লোকেরা মুসলিম বলেই দাবী করত। কিন্তু তারা নাবী রসূগণের মতো আল্লাহর বিধানে রাষ্ট্র শাসন না করে নিজেদের তৈরী ত্বাগুতী বিধানে রাষ্ট্র শাসন করত। তাই পরবর্তী নাবী এসে ঐ নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে আল্লাহর বিধান কায়েম করেছেন।

বর্তমানের নামধারী মুসলিম শাসকেরাও আখেরী নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে না; বরং মানব রচিত আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে।

---

[১] الحكم والتحاكم ১/২৩১ পৃষ্ঠা।

এখন এই সব নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে এদেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। নাবীদের সংঘাত সাধারণ কোন কাফের মুশরিকদের সাথে হয়নি, তাদের সংঘাত হয়েছে তদানীন্তন ত্বাগুতী শাসকদের সাথে। ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের সাথে, মুসা (আঃ) ফেরাউনের সাথে আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লার এর সংঘাত হয়েছে আবু জাহেল, আবু লাহাবের সাথে।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে আর তা হচ্ছে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে কুফরী বিধান জারী রেখে পাশ্ববর্তী কোন কুফর প্রধান রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েমের জন্য খন্ডযুদ্ধ ফলপ্রসূ হবে না। এজন্য প্রথমে মুসলমান নামধারী ত্বাগুতী শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে ইসলামী হুকুমত কায়েমের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। এরপর বৃহত্তর জিহাদের ডাক দিয়ে কুফর প্রধান রাষ্ট্রে আক্রমণ চালালে তবেই ফলপ্রসু হতে পারে।

অতএব নামধারী মুসলিম দেশের প্রতিটি ঈমানদার নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, নিজ নিজ দেশে সশস্ত্র জিহাদী কাফেলা গড়ে তোলা। কারণ প্রত্যেক সক্ষম ঈমানদার ব্যক্তির প্রতি স্বীয় বসবাসকারী ভূমিতে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র জিহাদ করা ফরজে আইন এবং অন্য কোন স্থানে অনুরূপ জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরজে কিফায়াহ।

বর্তমানে নামধারী মুসলিম সরকারগুলো আসলে মুসলমান কিনা তা জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।[১]

যে ব্যক্তি তার পার্থিব জীবনের কর্মকান্ড আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনা না করে তদস্থলে মানব রচিত বিধান দ্বারা পরিচালনা করে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের বেশী কষ্ট করতে হবে না। কারণ এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক দলীল রয়েছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِيْدًا

[১] গ্রন্থের নামঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'তের আকীদায় ইসলামী রাজনীতি শীর্ষক "আল ইমামাতুল উযমা ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ।" প্রণেতাঃ আব্দুল্লাহ বিন উমর সোলাইমান আদ্‌দামিজী। (উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয় মক্কা মুকার্‌রাম, আকীদা বিভাগ থেকে ডক্টরেট প্রাপ্ত) প্রকাশকালঃ মক্কা মুকার্‌রাম ২১/১১/১৪০৮ হিঃ প্রকাশনায়ঃ দারুত ত্বাইয়েবাহ, রিয়াদ, পোঃ বক্স নং ৭৬১২ সৌদি আরব। এ কিতাবের দ্বীন বিবর্জিত রাজনীতি অধ্যায় থেকে।

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা ত্বাগুতকে বিধানদানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে। পক্ষান্তরে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আল্লাহর আইন থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬০)

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে يَزْعُمُوْنَ শব্দটি দ্বারা পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে, যারা ত্বাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্থ্ করেছেন। সুতরাং তাদের অন্তরে ঈমান আছে আল্লাহ তা'আলা তা স্বীকার করেন না এই কারণে যে, তারা মানব রচিত আইনের কাছে বিচার প্রার্থনা করে।

যে ব্যক্তি মানব রচিত আইনে বিচার প্রার্থনা করে তার অন্তরে ঈমানের লেশ মাত্র থাকতে পারে না। কারণ ত্বাগুতের কাছে বিচার চাওয়া আর অন্তরে ঈমান থাকা পরস্পর বিরোধী দুটি জিনিস। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থঃ যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে যা ভাঙ্গবার নয়। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৫৬)

অতএব ত্বাগুত অস্বীকার করা ছাড়া ঈমান আনা অসম্ভব।

তাগুত طاغوت মূল (তুগঈয়ান) طُغيان থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো সীমা অতিক্রম করা। সুতরাং আল্লাহর প্রদত্ত আইনকে বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনে যারা শাসনকার্য চালায়, তারা طاغوت এবং বিচার পাওয়ার আশায় যারা মানব রচিত আইনের শরণাপন্ন হয়, তারা হলো তাগুতপন্থী।

প্রত্যেক শাসকের উচিত রাষ্ট্র পরিচালনা করলে তা আল্লাহর আইন দ্বারাই করা এবং জনগণের উচিত আল্লাহর আইনের নিকটই বিচার চাওয়া। অতএব যে আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করে আর যে উক্ত আইনের নিকট বিচার প্রার্থনা করে এরা উভয়েই সীমালংঘনকারী।

এ বিষয়টি আরও পরিস্কার করে সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতি শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নাজিলকৃত বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সে কাফের এতে কোন

সন্দেহ থাকতে পারে না। হয়তো তার কাজের দ্বারা কাফের অথবা বিশ্বাসের দ্বারা কাফের। এরূপ লোক মানব রচিত বিধান বিশ্বাস করলেও কাফের, আর বিশ্বাস না করে শুধু এ বিধান দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করলেও কাফের।

বর্তমান যুগে মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন তা হলো শাসন কর্তৃত্বে 'তাগুত' জেঁকে বসেছে এবং তারা মুসলমানদেরকে শাসন করার জন্য জাহেলী মতবাদকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর আল্লাহর বিধানকে না জানার ভান করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে। তাই মান্যবর উস্তাদ আহমদ শাকের (রহঃ) বলেন, আফসোসের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে, অনেক মুসলিম দেশে সে দেশের মুসলমানদের উপর এমন নাপাক ও দ্বীন শূন্য সংবিধান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যা ইউরোপ হতে আমদানীকৃত। যে বিধানের ধারা ও উপধারার অধিকাংশই ইসলামী বিধানের সহিত পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক; বরং কতিপয় বিধান ইসলামকে ভেঙে চুরমার করে ধ্বংস করে দিয়েছে। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। একমাত্র তারাই একথা অস্বীকার করবে যারা নিজেদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে বা দ্বীনের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ অথবা যারা বুঝে না বুঝে ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছে।

ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত এ সংবিধানে এমন কতক বিধান আছে যা ইসলামী শরীয়তের বিরোধী নয়। মুসলমানদের দেশে বাস্তবায়নকৃত এই ধরণের সংবিধান মানা জায়েয নয়। এমন কি ঐসব বিধানও মানা বৈধ নয় যেগুলো ইসলামী বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা সংবিধান প্রণেতারা তা প্রণয়নকালে এটা লক্ষ্য করেনি যে, ইসলামের সাথে কোনটির মিল আছে আর কোনটির মিল নেই। তাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের সংবিধানের সাথে মিল রাখা। যে কারণে ইউরোপের প্রভূদের রচিত সংবিধানই তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তিবর্গ চরম অপরাধী, ইসলাম হতে বহিস্কৃত মুরতাদ।

এই মহা পাপের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ সংবিধানগত বিষয়ে মুরতাদ হওয়ার হুকুমে চার ধরনের লোক শামিল রয়েছে।

১. মানব রচিত সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটি (প্রধান মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, এমপি) ঃ তারা তাদের রচিত সংবিধানকে সঠিক ও বাস্তবায়নের উপযোগী মনে করেই তা রচনা করেছে। ফলে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। যদিও তারা সলাত পড়ে, সাওম রাখে ও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে।

২. রক্ষক শেণী (এরূপ সংবিধান প্রয়োগকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী) ঃ মানব রচিত সংবিধানের ইসলাম বিরোধী আইনগুলো সঠিক মনে করে যারা তা প্রয়োগ ও প্রতিরক্ষা করে তারা সবাই মুরতাদ। আর যারা তন্মধ্যে অবস্থিত ইসলাম সমর্থিত আইনগুলির প্রয়োগ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে, তারা সবাই পাক্কা

মুনাফিক। যদিও তারা ওজর পেশ করে যে আমরা তো শুধু আমাদের চাকুরীর দায়িত্ব পালন করছি মাত্র।

৩. বিচারক (এরূপ সংবিধানের আইন দ্বারা, বিচারকার্য পরিচালনাকারী) ঃ এ শ্রেণীর লোকেরা মানব রচিত সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনগুলি প্রয়োগকালে হয়ত বলতে পারে, আমরা কাফের হলাম কিভাবে? কিন্তু যখন ইসলাম বিরোধী আইনগুলো প্রয়োগ করে তখন তারা কি আপত্তি পেশ করবে? যদিও কুরআন-হাদীসের দলীল অনুযায়ী তাদের এরূপ আপত্তির কোন মূল্য নেই। নিশ্চয়ই তারা এই হাদীসের আওতাভূক্ত। মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ

بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অর্থঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশ মানতে হবে তা পছন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ না অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। সেই নির্দেশটি যদি গুনাহের কাজের জন্য হয় তবে তা শুনাও যাবে না এবং আনুগত্যও করা যাবে না।[১]

এবার চিন্তা করে দেখুন বিচারক যখন শরীয়ত বিরোধী হুকুম বাস্তবায়ন করে তা শুধু গুনাহের কাজ নয়; বরং তা স্পষ্ট কুফরী কাজ। যেখানে গুনাহের কাজের জন্য নির্দেশিত হলে তা অমান্য করার হুকুম দেয়া হয়েছে, সেখানে কুফরী কাজের জন্য নির্দেশিত হওয়ার পর তাদের কি করা উচিত ছিল? অতএব, কুফরী ফয়সালা প্রদান করে পূর্বের দুই শ্রেণীর ন্যায় ঐ বিচারকও মুরতাদ হয়ে গেছে।

৪. জনগণঃ যারা সন্তুষ্ট চিত্তে উক্ত বিধানের অনুসরণ করে থাকে বা সমর্থন করে, তবে তারাও শাসক শ্রেণীর ন্যায় মুরতাদ হয়ে যাবে। অতএব জনগণের উচিত মানব রচিত বিধানের শরণাপন্ন না হওয়া এবং উহাকে অবৈধ ঘোষণা করা। এরূপ বিধান পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা এবং এরূপ বিধান মানা যে হারাম তা প্রচার করা। আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার চাপিয়ে দেন না।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ

فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَّنْ رَّضِيَ وَتَابَعَ

[১] সহীহ মুসলিম ৪৬৫৭, ইফাবা হাঃ ৪৬১১, ইসে হাঃ ৪৬১৩।

অর্থঃ উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ভবিষ্যতে তোমাদের এমন অনেক নেতা হবে যাদের কিছু কাজ তোমাদের শরীয়ত সম্মত মনে হবে আর কিছু তার বিরোধী মনে হবে, সে সময় যারা তা অপছন্দ করবে তারা অনুরূপ পাপী হওয়া থেকে বেঁচে যাবে আর যারা প্রতিরোধ করবে তারা (উভয় জগতে) নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যারা সন্তুষ্ট থাকবে ও অনুসরণ করে যাবে তারা নেতাদের মতই পাপী হবে।[১]

কোন অবস্থাতে মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে কিতাল করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হয়?

এ বিষয়টি পরিস্কার ভাবে বুঝার জন্য দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ খায়ের হাইকাল এর লিখিত-

الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ‘শরীআ’তের রাজনীতিতে জিহাদ ও কিতাল’ নামক গ্রন্থের দলীল ভিত্তিক আলোচনা সহায়ক হবে। যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

একজন মুসলমান শাসক (আমীরুল মুমিনীন) যদি জনগণের উপর জুলুম করে, তাদের হক আদায় না করে অথবা নিজে গোপনীয় কোন পাপে লিপ্ত হয় বা কারো অধিকার নষ্ট করে তবে ইসলাম রক্ষার স্বার্থে এসব জুলুম সহ্য করতে হবে, প্রয়োজনে প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না বা তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে জিহাদী দল গঠন করে সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা করা যাবে না। কিন্তু যদি কোন মুসলিম শাসকের কার্যকলাপ ব্যক্তিগত পর্যায়ে না থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছে যা كُفْرًا بَوَاحًا স্পষ্ট কুফরীতে পরিণত হয় এবং তা কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তবে ঐ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থঃ উবাদা বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (দ্বীনের দিকে) আহবান করলেন, আমরা তার নিকট বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করলাম।

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪৬৯৫, ইফাবা হাঃ ৪৬৪৮, ইসে হাঃ ৪৬৫০।

তিনি আমাদের কাছ থেকে যেসব বিষয়ের শপথ নিয়েছিলেন তা হচ্ছে, আমাদের সুখের-দুঃখের, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল এবং স্বার্থহানীর অবস্থায় শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব। এ মর্মে আরও শপথ করলাম যে, ক্ষমতাসীনদেরকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করব না। কিন্তু যদি তাদেরকে এমন কুফরী কাজ করতে দেখ যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে সশস্ত্র জিহাদ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত কর।[১]

ইসলামী রাষ্ট্রে অনৈসলামী কাজের ব্যাপক প্রকাশ ও পরিব্যপ্তির কারণে সে দেশের মুসলিম শাসক ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারায়। এ সম্পর্কে মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে স্পষ্ট বর্ণনাদি এসেছে যা একত্রিত করলে দেখা যায় এরূপ কাজ প্রথমত পাঁচ ধরণেরঃ

১.শাসক যদি সলাত না পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

২.শাসক যদি সাওম না রাখে, তবুও তার বিরুদ্ধে শসস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। হাদীস হতে এর দলীলঃ

اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ "لَا مَا صَلَّوْا"

অর্থঃ (সাহাবীগণ অন্যায়কারী শাসকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন) হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করব না? তিনি বললেন, তারা যতদিন সলাত পড়ে ততদিন এরূপ করনা।[২]

হাদীসের মর্ম এই যে, সলাত, সাওম এ দু'টির আমল যদি শাসকদের মধ্যে না থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে।

৩. শাসক যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে সলাত প্রতিষ্ঠা না করে, তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। সলাত প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রের (মুসলিম) নাগরিকদেরকে সলাত পড়ার নির্দেশ দেয়া এবং কেউ এ নির্দেশ অমান্য করলে (সলাত না পড়লে) কৈফিয়ত তলব করা ও তার বিচারের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা।

শাসক যদি রাষ্ট্রে সলাত প্রতিষ্ঠা না করে তবে সে ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারায় এবং তাকে হত্যা করতে হয়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হতে দলীলঃ

---

[১] সহীহ বুখারী ৭০৫৬, ইফাবা হাঃ ৬৫৭৮, সহীহ মুসলিম ৪৬৬৫, ইফাবা হাঃ ৪৬১৯, ইসে হাঃ ৪৬২০

[২] সহীহ মুসলিম ৪৬৯৪, ইফাবা হাঃ ৪৬৪৭, ইসে হাঃ ৪৬৪৯।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ

অর্থঃ আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উত্তম রাষ্ট্রনায়ক তারাই যাদের তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে, আর তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে এবং তোমাদের নিকৃষ্ট রাষ্ট্রনায়ক তারাই যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট এবং তারাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমরা তাদেরকে অভিসম্পাত কর, তারাও তোমাদের অভিসম্পাত করে। বলা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কি তলোয়ার দ্বারা তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত করে দেব না? তিঁনি বললেন, তারা যতদিন তোমাদের মাঝে (রাষ্ট্রে) সলাত কায়েম রাখে ততদিন এরূপ করনা।[১]

এ হাদীস আমাদের এই নির্দেশনাই দেয় যে, সলাত প্রতিষ্ঠা না করা একজন মুসলমান শাসকের জন্য এমন অপরাধ যে, এর ফলে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করতে হবে। মুমিনদের শাসক বানানো হয় আল্লাহ তা'আলার হুকুমগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য। সলাত এমন একটি হুকুম যা তরক করার কারণে মুমিন কাফেরে পরিণত হয়ে যায়। তাই রাষ্ট্রে সলাত প্রতিষ্ঠার কাজ ছেড়ে দিলে সেই শাসকের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়; বরং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. কোন মুসলিম শাসকের জানা মতে সমাজে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে করা হচ্ছে কিন্তু সে বাধা দিচ্ছে না। যেমন- মাইকে অশ্লীল গান বাজানো, মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা, ব্যাংক-বীমা, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুদ নেয়া, রাস্তায় রাস্তায় লটারীর টিকিট বিক্রয়, যেখানে সেখানে মূর্তি স্থাপন, মাজার প্রতিষ্ঠা করা, মাজারে সেজদা করা, মান্নত করা ইত্যাদি নাফরমানীর কাজ দেশে ব্যাপক হারে চলছে। যার কারণে ঐ শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে অপসারণ করতে হবে। হাদীসে এসেছে-

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪৬৯৮, ইফাবা হাঃ ৪৬৫১, ইসে হাঃ ৪৬৫৩।

أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ مَعْصِيَةُ اللهِ بَوَاحًا

অর্থঃ (আমরা বাইয়াত করার কালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি) ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেব না, তবে যদি তাদের শাসনামলে আল্লাহর নাফরমানী প্রকাশ্যে সংঘটিত হয় (তবে অবশ্যই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেব)।[১]

৫.শাসক যদি কাউকে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী কাজের নির্দেশ বা অনুমতি দেয়। যেমন-রেডিও-টেলিভিশনে বা জনসম্মুখে অশ্লীল গান-বাজনা, যাত্রা-সিনেমা, মদ-জুয়া, সংবর্ধনা নৃত্য, নর্তকী আমদানী, পতিতালয় সংরক্ষণ, এন.জি.ও প্রতিষ্ঠা, ফটো স্থাপন, মূর্তি স্থাপন, অগ্নি প্রজ্জলন, সুদী ব্যাংক, বীমা ইত্যাদির লাইসেন্স বা অনুমতি দেয়, তবে তার এ নির্দেশ বা অনুমতি দেয়ার কারণে ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারাবে এবং সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَالَمْ يَأْمُرْكَ بِإِثْمٍ بَوَاحٍ

অর্থঃ শাসক তোমাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজের আদেশ না করলে তুমি তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করনা।[২]

অর্থাৎ শাসক যদি তোমাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজের নির্দেশ বা অনুমতি দেয় তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত কর। দলীল ভিত্তিক উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, কোন মুসলিম শাসক যদি উপরোক্ত পাঁচটি কাজের মধ্য হতে যে কোন একটি কাজ করার অপরাধী সাব্যস্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সেখানে ন্যায়পরায়ণ মুত্তাকী শাসক বসাতে হবে। যিনি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন।

এবার এমন একটি বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে যা আগের পাঁচটি কাজের চেয়েও জঘন্যতম। যাকে ইহদার আশ্-শারঈয়াহ বলা হয়। اهدار الشرعية এর অর্থ হল- “ইসলামী সংবিধানকে বাতিল করে দেয়া।”

একজন মুসলিম শাসক ইহদার আশ্-শারঈয়াহ করার অপরাধে ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারায়। এরূপ শাসককে আল্লাহ তা’আলা কাফের ঘোষণা করেছেন এবং কুরআন মাজীদে বহু জায়গায় এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন।

---

[১] ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ১৩ খন্ড ৮ম হাদীস।

[২] ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ১৩খন্ড।

ইসলামী শরীয়ত বা সংবিধানকে বাতিল করার তিনটি অবস্থা হয়ে থাকেঃ

১. ইসলামী বিধান বাদ দিয়ে অনৈসলামিক মনগড়া মানব রচিত বিধান বাস্তবায়ন করা। যারা এরূপ করবে তারা শরীয়তকে অকেজো বা বাতিল করে দেয়, ফলে তারা মুসলমান থাকতে পারে না; বরং কাফের হয়ে যায়।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

অর্থঃ আর যেসব লোক আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করেনা, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৪৪)

২. কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান এবং কিছু ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র চালানো এটাও পূর্ণ শরীয়তকে বাতিল করে দেয়ার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা এরূপ কিছু কিছু বিধান নিজের পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন না করার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। যারা এরূপ করল তারা পূর্ণ শরীয়তকেই বাতিল করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ

অর্থঃ আর আমি আদেশ করছি যে, তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ তা'আলা যা নাজিল করেছেন তদানুযায়ী ফায়সালা করুন। তাদের প্রভৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কিছু বিষয় থেকে বিচ্যুত না করে যা আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ৪৯)

৩. যদি কোন মুসলিম শাসক এমন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যারা ইসলাম পালনকারীদের সহ্য করতে পারে না, ঈমানদারদের উপর দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন চালায়, মুসলমানদের ঈমান-আকীদাহ ধ্বংসের পায়তারা করে, ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন মুছে ফেলে ইসলামদ্রোহী কৃষ্টি-কালচার বিকাশে চেষ্টা করে, এই অবস্থায় যদি উক্ত মুসলিম শাসক তাদের এই সকল কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয় তবে সে মুসলিম ও ইসলাম বিধ্বংসী কার্যক্রমে সহযোগিতা করল বিধায় সে ইসলামী শরীয়তকে বাতিল করে দিল এবং সেও তাদের মতো কাফের হয়ে গেল।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও অথচ তারা তোমাদের কাছে আগত সত্যকে অস্বীকার করেছে। (সূরা মুমতাহিনা ৬০ ঃ ১)

এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ইসলামকে প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে ইসলামী পদ্ধতিতে আমীর নির্বাচিত হয়েছে সে যদি كُفْرًا بَوَاحًا বা اهدار الشرعية - এর কোন একটি কাজ করে তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু যারা মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআনের শাসন বিরোধী সংবিধান বাস্তবায়ন করার শপথ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তারা এসব শাসকদের চেয়েও জঘণ্যতম। অতএব এরূপ শাসকের রাষ্ট্রে বসবাসকারী ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের নিকটবর্তী এই কাফের শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ কর। ইহা প্রতিরোধমূলক জিহাদ বিধায় প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ১২৩)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ

অর্থঃ তারা কি জাহেলী বিধানের ফায়সালা কামনা করছে? আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা ঈমানদারদের জন্য উত্তম ফায়সালকারী কে? (সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৫০)

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, "তাতারী মুসলিম শাসকগণ 'আল-ইয়াসেক' নামক সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করত। যা ছিল ইয়াহুদিয়্যাত, নাসরানিয়্যাত, ইসলাম ও নিজেদের চিন্তার সমন্বয়ে চেঙ্গিস খানের রচিত একটি ভিন্নধর্মী সংবিধান। যারা তাদের মতো এ ধরণের সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তারাও কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত না ঐ

সংবিধান পরিত্যাগ করে ইসলামী সংবিধানের দিকে ফিরে আসে। কেনান ছোট বড় বা যে কোন সাধারণ ব্যাপারেও কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোন বিধান গ্রহণ করা যাবে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সবচেয়ে বড় শত্রু যে কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে জাহেলী বিধান অনুসন্ধান করে।”[১]

“তাতারীদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) যখন চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন, তখন ঐ সময় একটি প্রশ্ন উঠানো হয় যে, আর যাই হোক তাতারীরা মুসলমান; অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ধর্মীয় বিধানমতে কতটা সঙ্গত? ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এই দন্ধের নিরসন ঘটিয়ে বলেন, তাতারীরা খারিজীদের ন্যায় বিবেচিত হবে এবং যদি তোমরা আমাকেও তাতারীদের কাতারে কুরআন মাজীদ মাথায় নিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পাও সে অবস্থায় তোমরা আমাকে হত্যা করবে। এতে করে লোকদের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ দূরীভূত হয়ে যায় এবং তারই নেতৃত্বে তাতারী নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।”[২]

মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েমের জন্য কিতাল করা যাবে কি?

ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মুসলিম প্রধান দেশে কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদ করার দলীল হিসাবে ডঃ মুহাম্মদ খায়ের হাইকাল তার ‘শরীয়তের রাজনীতিতে জিহাদ ও কিতাল’ নামক গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায় চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। শাসক যদি মুরতাদে পরিণত হয়ঃ উসমানী শাসনামলের সর্বশেষ খিলাফত পদ্ধতি বিলুপ্ত হওয়ার পর ইসলামী বিচার ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতঃ তদস্থলে কাফেরদের রচিত সংবিধানের বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কারণে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দ্বীন বিমুখতা আসে ও শাসকগণ মুরতাদ হয়ে যায়। কেননা রাষ্ট্র পরিচালনায় যখন শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পাশ্চাত্যের কুফরী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, তখন মুসলমান শাসকগণ মুরতাদে পরিণত হয়। অতঃপর তারা সাম্রাজ্যবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকে চাই তা ধনতন্ত্রী হোক বা সমাজতন্ত্রী। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত শাসকদের কাছে ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না যদিও তারা সলাত পড়ে, সাওম রাখে এবং নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। আর এভাবেই রাষ্ট্রে কুফরী শাসন ব্যবস্থা বিজয় লাভ করে, যদিও সেই রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান। কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে কুফরী শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সে দেশের প্রত্যেক মুসলমান নাগরিকের সশস্ত্র জিহাদের জন্য ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়া উচিত।

---

[১] সূরা মায়েদা ৫ ঃ ৫০, তাফসীরে ইবনে কাসীর।

[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তাইমিয়াহ- নামক গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত।

২। শরীয়তের উসূলী কায়দাঃ ما لايتم به الواجب الا فهو واجب যে কাজ সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন ফরজ কাজ সম্পাদন করা যায় না তখন ঐ কাজ করাও ফরজ হয়ে যায়। যেহেতু বর্তমানে আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই আর আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ইসলামী শাসন ফরজ করেছেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ফরজ। এরপর কিতাল ছাড়া যেহেতু অন্য কোন উপায়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার বিধান নেই, কেননা আল্লাহ তা'আলা কিতালের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে বলেছেন। অতএব, উসূলী নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য কিতাল করা ফরজ।

৩। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলেঃ মুসলমানগণ ইসলামের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সে দেশের প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ইসলামী দেশগুলোতে হানাদার শত্রু এখন মুসলমানদের ভিতর থেকেই তৈরী হচ্ছে। সকল ক্ষমতার চাবি-কাঠি এখন তাদেরই হাতে এবং তারাই দেশের শাসক। তারা ঈমানদারদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধান জারী করেছে। সুতরাং বহিঃশত্রুর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে এদের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র জিহাদ করা ফরজে আইন। অর্থাৎ সলাত, সাওম যেমন ফরজ এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কিতাল করাও তদ্রুপ ফরজ। সুতরাং উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ দুশমনদের হাত থেকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

৪। শাসক كُفْرًا بَوَاحًا প্রকাশ্যে কুফরী কাজ করলেঃ যখন কোন মুসলিম শাসক প্রকাশ্যে কুফরী কাজ করে তখন মুসলমান নাগরিকদের নিকট থেকে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার হারায় এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত হয়, সে অবস্থাতে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়।[১]

অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, কোন শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হলে ঐ শাসক কাফের হওয়া শর্ত নয়; বরং ঐ শাসক মুসলমান হলেও তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে যদি সে তার রাষ্ট্রে শরীয়তবিরোধী কাজের অনুমতি দেয় বা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক নিজেরাই শরীয়ত বিরোধী কাজ করে।

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)-গণের যুগেও এরূপ অনেক মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র জিহাদ হয়েছে, ইসলামের ইতিহাস তার সাক্ষী। ঐ যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামদ্রোহী কত নামধারী মুসলিম শাসকদের

---

[১] ইতিপূর্বে كُفْرًا بَوَاحًا এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিরুদ্ধে দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ হয়েছে আমরা তার সবগুলোর খবর রাখি না। আর এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ চলতে থাকবে।

মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের সম্পর্কে ধারণাঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ আর যেসব লোক আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৪৪)

কেউ কেউ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কাফের হওয়ার হুকুমকে শুধু ইহুদী, নাসারা ও মুশরিক শাসকদের জন্য খাস করে থাকেন। মুসলমান শাসকদের জন্য এ হুকুমকে প্রযোজ্য মনে করেন না। এটা একটা ভূল ধারণা; এ প্রসঙ্গে শায়খ ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন- "আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত বিধানে ফয়সালা করা এক মহাকুফর, সবচেয়ে ক্ষতিকর কুফর ও সবচেয়ে জঘণ্যতম কুফর। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিরোধিতাকারী, শরীয়তের বিধানের সাথে ধৃষ্টতা পোষণকারী এবং শারয়ী কোর্টের সাথে সাংঘর্ষিক ও তার মূল শাখা, আকৃতি-প্রকৃতি, বিধান-দলীল, প্রমাণ-পঞ্জীর সাথে সকল দিক দিয়ে বিরোধী। ইসলামী কোর্টের জন্য যেমন একটি সংবিধান রয়েছে, যার সম্পূর্ণ ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। অনুরূপভাবে বর্তমান কোর্টের জন্য এমন বিধান রয়েছে যা ফরাসী, আমেরিকান, বৃটিশ ও নব-আবিস্কৃত মতবাদ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ধরণের কোর্ট-কাচারী বর্তমানে অধিকাংশ দেশে বিদ্যমান। যার পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। আর সেখানে বিচারের আশায় মানুষ যাচ্ছেও দলে দলে। বিচারকগণ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ফয়সালা জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং ঐ বিধান স্বীকার করতে বাধ্য করছে। রিসালাতের স্বীকৃতি ভঙ্গ করার জন্য এই কুফরীর চেয়ে বড় কুফরী আর কি হতে পারে?"[১]

শায়খ আব্দুল আজিজ মোস্তফা কামেল তাঁর লিখিত الحكم والتحاكم গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন- "যারা বলে যে, ইসলামী সংবিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা মুসলমান না কাফের, সালফে সালেহীনগণ এ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন, তাদের এ কথা মোটেও ঠিক নয়; বরং এটা অবান্তর এবং সালফে সালেহীনদের উপর মিথ্যা তোহমত, বিজ্ঞ আলেম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমানও এ কথা বলতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তার পরেও সে মুসলমান হিসেবে বহাল থাকবে। এ প্রসঙ্গে শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ- এর ফাতওয়া আল জামেয়া ফি তালাবিল ইলম-ই-শরীফ প্রথম খন্ড ১৪৬ পৃষ্ঠায় বলেন-

---

[১] আল ইমামাতুল উযমা ইনদা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ গ্রন্থের ১০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গণতান্ত্রিক দেশের একজন সংসদ সদস্য (এমপি, মন্ত্রী) জনগণেরই ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণকে শাসন করার জন্য আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জন করে। এটা মানুষের উপর নিজের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কারণ, কোন আইন দ্বারা তাঁর বান্দাকে শাসন করতে হবে তা প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও দেন নাই, কেননা এটা একমাত্র তাঁরই জন্য খাস। সৃষ্টি যার আইন তাঁর।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ "জেনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।"

(সূরা আরাফ ৭ ঃ ৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার অধিকার নাই।"

(সূরা ইউছুফ ১২ ঃ ৪০)

অতএব কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়নের কাজ যে ব্যক্তি করল, সে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত নিজেকে ইলাহ বানাল এবং সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করল। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছেঃ كفر اكبر কুফরে আকবার যা কোন ব্যক্তিকে ইসলামের সীমারেখার বাইরে নিয়ে যায়। خارج عن الملة সে মুসলিম জাতি হতে খারিজ, মুরতাদ।

বর্তমানে এদেশে কোন কোন দল ইসলামের নামে গণতন্ত্রের রাজনীতি করছে এবং ত্বাগুতের সাথে ঐক্য করে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী সংবিধানের অধীনে এম.পি/মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন এবং মানব রচিত সংবিধানে রাষ্ট্র চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এভাবেই তারা ইকামাতে দ্বীনের দাবী করছেন।

মক্কার কাফেররা তাদের সাথে ঐক্যের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। যদি তাগুতের সাথে ঐক্য করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যেত তাহলে ইসলামের সেই দূর্দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবকে হিকমত আখ্যা দিয়ে সাদরে গ্রহণ করতেন।

বস্তুতঃ যখন কোন ঈমানদার সম্প্রদায় তাগুতের সাথে একীভূত হয় প্রকৃতপক্ষে তখন তারা দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং আস্তে আস্তে তাদের অন্তর হতে ঈমানের দ্বীপশিখা নিভে যায়, ফলে তারা ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এমন সম্প্রদায়ের হাতে ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব দেবেন যারা নাবী-রসূলগণের মতো সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারীর তিরস্কারে ভীত হবেনা।

(সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৫৪)

এ আয়াতের তাফসীরে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)- এর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে; তিনি বলেন-"যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সকল জিন, মানব ও বিশ্বে যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।"[১]

আজ গণতন্ত্রকামী নামধারী ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের মাঝে আবু বকর (রাঃ) এর জিহাদী চেতনা হারিয়ে গেছে। তাই তারা তাগুতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ না হয়ে তাদের সাথে ঐক্য করেছেন এবং সাধারণ মুমিনদেরকে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার প্রলোভন দেখিয়ে নিজেরা ক্ষমতার স্বাদ চেখে বেড়াচ্ছেন। আর হিকমতের দোহাই দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজগুলো নির্দ্বিধায় করে যাচ্ছেন। এভাবেই তারা একটি যোদ্ধা জাতির অতীত ঐতিহ্যকে ভূলিয়ে দিয়ে নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়ে তাদেরকে অধঃপতনের অতল তলে নিয়ে যাচ্ছেন।

আর এক শ্রেণীর লোকেরা ভাবছে, ঈমানদাররা দুনিয়াতে খুব সহজ-সরল জীবন যাপন করবে। সকালে উঠে সলাত পড়বে তারপর যার যার শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি নির্ধারিত কাজে-কর্মে ছড়িয়ে পড়বে এবং রাত হলে ঘুমিয়ে পড়বে এই তাদের রুটিন। অতএব কে আল্লাহর আইন মানল আর কে মানল না তা দেখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ-জিহাদ, মারামারি-কাটাকাটি এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়ানোর কি দরকার? বাস্তবে ঈমানদারগণ কোন সাধারণ মানুষ নয়। এরা আল্লাহর প্রতিনিধি, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারী আল্লাহর সৈনিক। সৈনিকদেরকে যেমন দেশ প্রতিরক্ষা ও আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার জন্য তৈরি করা হয় তদ্রুপ আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও তাঁর আইন বাস্তবায়ন করার জন্য মুমিন নামে কিছু সৈনিক তৈরী করেছেন।

[১] তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

আর এদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যুগে যুগে নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন। তাদের কাজ ছিল সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আল্লাহর আইর বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর পথে সশস্ত্র জিহাদ করা।

কোথাও কেও আইন অমান্য করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য যেমন সশস্ত্র দল পাঠাতে হয়, তেমনি সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর আইন প্রষ্ঠিার মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা আখেরী নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মতদেরকে সশস্ত্র সৈনিক রূপে প্রেরণ করেছেন। যারা কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদের এই ধারাকে অব্যাহত রাখবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ وَجُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ

وَالصَّغَارُ عَلٰى مَنْ خَالَفَ أَمْرِيْ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থঃ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর আমার রিজিক (গনিমতের পন্থায়) বল্লমের ছায়ার নিচে রেখে দেয়া হয়েছে। অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের ভাগ্যেই অর্পন করা হয়েছে যারা আমার আদেশের বিরোধিতা করবে এবং যে ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের আদর্শ গ্রহণ করবে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।[১]

অতএব যে সকল মুমিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ গ্রহণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ করে অতঃপর তারা মারে ও মরে।

(সূরা তাওবাহ ৯ঃ ১১১)

একজন মুমিনকে জানতে হবে, আমি কে? আমার দায়িত্ব কি? আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন রক্ত ঝড়িয়েছেন? আমার পূর্ববর্তী মুমিন ভাইগণ কীভাবে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন? আমাকেও জান্নাত পেতে হবে। তাই সকল ভ্রান্ত পথ ছেড়ে দিয়ে শাহাদাতের সেই সিরাতুল মুস্তাকীমের পথিক হতে হবে।

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ৫৬/৮৮ 'তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে অধ্যায়'। মুসনাদে আহমাদ ৫০৯৪।

একজন মুমিনকে জানতে হবে, আমি কে? আমার দায়িত্ব কি? আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন রক্ত ঝড়িয়েছেন? আমার পূর্ববর্তী মুমিন ভাইগণ কীভাবে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন? আমাকেও জান্নাত পেতে হবে। তাই সকল ভ্রান্ত পথ ছেড়ে দিয়ে শাহাদাতের সেই সিরাতুল মুস্তাকীমের পথিক হতে হবে।

দ্বীন কায়েমের সঠিক আকীদা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দীর্ঘ দিনের লালিত অনেক চিন্তা চেতনার উপর হয়ত আঘাত এসেছে। আমাদেরকে বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, কেন আমরা ইসলামী হুকুমত হারালাম? কেন আর নতুন করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে না? কাফের-মুশরিকদের চক্রান্তে পড়ে কেন বার বার পথ হারাচ্ছি? কেন ইসলামের আকাশে সোনালী সূর্যের উদয় হচ্ছে না? তাই কারো প্রতি হিংসা নয়, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, কাউকে কটাক্ষ করা নয়, কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে নয়; আসুন আমরা বাস্তবতায় ফিরে আসি।

আজ আর আমাদের বসে থাকার সময় নেই। কাফের-মুশরিকরা গোটা বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হতে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন ধ্বংস করে দিয়ে পূর্ণ কুফরী রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী এন.জি.ও প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের ঈমান কেড়ে নিচ্ছে; অন্যদিকে কুফর রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের সম্রাজ্য বিস্তার করে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি ও জিহাদী প্রেরণা মিটিয়ে দেয়ার জন্য সুচতুর পরিকল্পনা একের পর এক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এমন নাযুক পরিস্থিতিতে বিশ্ব মুসলিমদের প্রতি আহবানঃ

আসুন আমরা বিভিন্ন ফিরকা, তরীকা, মাযহাব, জামাআ'ত, জমঈয়ত, আন্দোলন, সংঘ ইত্যাদির মধ্যে যে সকল মত পার্থক্য রয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করি। একজন মুসলিমের দায়িত্ব হিসেবে দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত কিতালের বিধানকে নির্ভয় চিত্তে মেনে নেই। আমাদের মুসলিম প্রধান দেশগুলো হতে সশস্ত্র দিফায়ী (প্রতিরোধ মূলক) জিহাদের মাধ্যমে তাগুতী হুকুমত উৎখাত করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করি। এভাবে একের পর এক নামেমাত্র মুসলিম দেশকে পূর্ণ ইসলামী শাসনে এনে পরস্পর একতাবদ্ধ হই। অতঃপর কুফর প্রধান দেশগুলোতে ইক্বদামী (অগ্রাভিযান মূলক) জিহাদ করে সারা বিশ্বকে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে নিয়ে আসি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। আমীন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ

যে কারণে এই বই লেখা

একদা বিশ্বের শাসক ছিল মুসলিম জাতি, আল কুরআনের পরিভাষায় তারা সর্বোত্তম উম্মত। সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত একচ্ছত্র শাসক ছিল তারা এবং বিশ্বে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। সেই জাতির উত্তরসূরীরা এখন বিশ্বে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষণ-বঞ্চনার শিকার, অশান্তির আগুনে জ্বলছে মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহ। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এ অধঃপতিত জাতি তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ছোঁয়া লেগেছে মুসলিম বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খন্ড বাংলাদেশেও। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন বিজাতীয়দের গোলামী করার দরুন যে হীন মানসিকতা, আকীদার বিকৃতি, ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্তির পাহাড় জমে ছিল, তা'থেকে এখনও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। দ্বীনকে বিজয়ী করাই ইসলামের মহান লক্ষ্য, এ সম্পর্কে এখনও আমরা অজ্ঞ। কুফরী চক্রের পরিকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির ফলে ফিরকাবাজী ও ধর্মের নামে ধর্ম বিরোধী আকীদাকে আকঁড়ে ধরে আছি। কুরআন-হাদীসের পথ ছেড়ে বিজাতীয়দের শিখিয়ে দেয়া বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, ইজমকে বেছে নিয়েছি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ হিসেবে।

কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল 'কিতাল'। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত পথেই। গণতন্ত্র, গণ-অভ্যুত্থান, সমাজ বিপ্লব,সমাজ সংস্কার প্রভৃতি প্রচলিত যেসব পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে তা' কুরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী এবং পন্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিতালের পদ্ধতি নিয়ে যেসব বিভ্রান্তি রয়েছে তা' অপনোদনই এ বই লেখার মূখ্য উদ্দেশ্য। কোন মু'মিন এ বই পাঠান্তে বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে যদি কিতালের মাধ্যমে দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হন তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

বিনীত

প্রকাশক